ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে

The Ahmadi
Fortnightly

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্মদী

ঈদ-উল-আযহা সংখ্যা

নব পর্যায় ৭৫ বর্ষ | ৭ম ও ৮ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩০ আশ্বিন-১৬ কার্তিক, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ | ২৮ জিলক্বদ-১৪জিলহজ্জ, ১৪৩৩ হিজরি | ১৫-৩১ ইখা, ১৩৯১ হি. শা. | ১৫-৩১ অক্টোবর, ২০১২ ঈসাব্দ

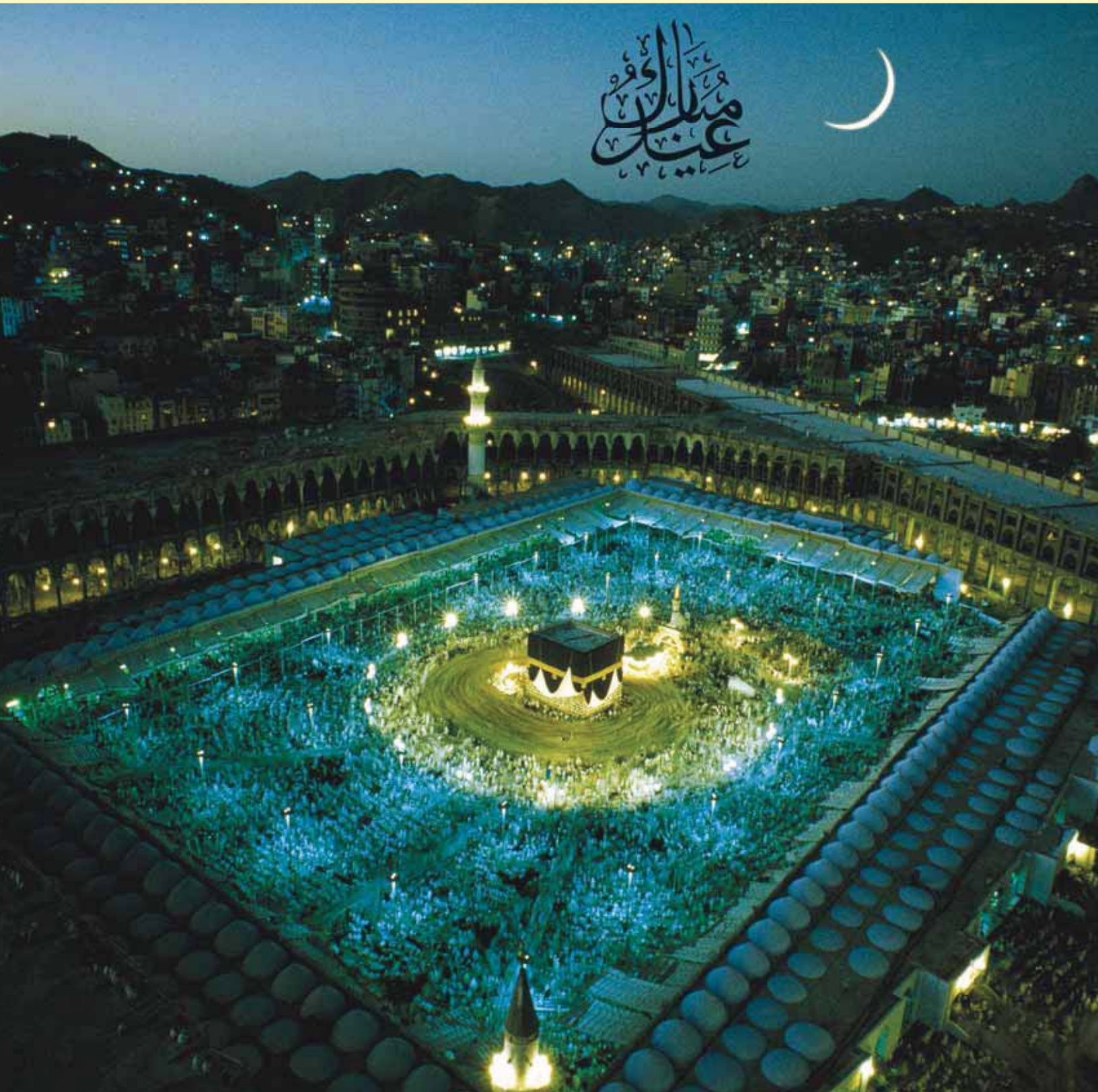

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com
Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon Since 1983

www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

মহানবী (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, তাঁর আদর্শ প্রচার ও বিস্তারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত

অধুনা বাক-স্বাধীনতা'র নামে অপরের চরিত্র হণনের হীন কর্মকে বৈধতা দিয়ে একবিংশ শতাব্দীর এই বিশ্ব বর্বরতার যুগকেও হার মানিয়ে দিচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। নইলে বিশ্বের লক্ষ-কোটি মুসলিম উম্মাহ-র হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে তথাকথিত Innocence of Muslims নামক এই ন্যাক্কারজনক চলচ্চিত্র Visual মাধ্যমে বিশ্ব-মোড়লের দাবীদার যে রাষ্ট্র সেখান থেকে নির্মিত হয়ে ছড়াতে দেয়া হলো কী করে!

'আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইন্টারন্যাশনাল' এর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে। শুধু তাই নয় লক্ষ্যণীয় হলো নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বিগত ২৭ জুন ২০১২ তারিখে Capitol Hill এর সিনেটরগণের উপস্থিতিতে জনাকীর্ণ কক্ষে বিশ্ব-শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় ন্যায়ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরে তথাকথিত বিশ্ব-মোড়লের ভ্রান্তিগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে অকাট্য যুক্তি দ্বারা দেখিয়ে দিলে, বিশ্বের সামনে বাস্তব অবস্থা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। শান্তি সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির আকাঙ্খী যারা, নিঃসন্দেহে তারা তা পাঠে আশান্বিত হবেন। আমাদের এই সংখ্যায় আমরা অমূল্য সেই ভাষণটি পত্রস্থ করেছি।

অপর দিকে ইউরোপের লন্ডনস্থ বায়তুল ফুতুহ মসজিদে ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় তিনি (আই.) ওই ন্যাক্কারজনক ঘৃণ্য চলচ্চিত্রের প্রেক্ষিতে মুসলিম উম্মাহ-র প্রতি আন্তরিক আহ্বান সম্বলিত সঠিক ও কার্যকর প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের দিকদর্শী পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন। যে পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির সাধ্য কারো নেই। আমরা উক্ত খুতবাটিও এই সংখ্যায় পত্রস্থ করেছি। খাঁটি রসূল প্রেমী পাঠকগণ এথেকে আসল পথের সন্ধান পাবেন।

মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্যকারী ইমাম আখেরুজ্জামান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পঞ্চম এই খলীফা আহমদীয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী উদযাপনকালে বয়আতকৃত সকল আহমদী মুসলমানের কাছ থেকে ২৭ মার্চ, ২০০৮ যে অঙ্গীকার নেন তার অংশ বিশেষ পাঠকদের জ্ঞাতার্থে আমরা তুলে ধরছি :

"আমরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে অঙ্গীকার করছি, আমরা ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রসার আর হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। পবিত্র এই দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে সর্বদা আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে রাখবো এবং সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করে ইসলামের পতাকাকে বিশ্বের প্রতিটি দেশে কিয়ামতকাল পর্যন্ত সমুন্নত রাখবো।"....

অতএব, আমরা ইসলামের মহানবী (সা.)-এর সেই মর্যাদা দেখার প্রত্যয় নিয়ে প্রচেষ্টারত আছি। মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের শীঘ্র সেই সুদিন দেখবার সৌভাগ্য দান করুন যা হলো ইব্রাহীমী ও ইসমাইলী কুরবানীর প্রকৃত ফসল।

সকলকে পবিত্র ঈদুল আযহার অভিনন্দন–

ঈদ মোবারক।

mwPc Î

১৫-৩১ অক্টোবর ২০১২

কুরআন শরীফ ২
হাদীস শরীফ ৩
অমৃত বাণী ৪
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত
জুমুআর খুতবা (২১ সেপ্টেম্বর ২০১২) ৫
জাতিসমূহের মাঝে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সুসম্পর্কই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ ১৩
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত
ঈদুল আযহার খুতবা ১৯
বাঙ্গালী-আহমদীদের উদ্দেশ্যে
হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) প্রদত্ত
দিক-নির্দেশনামূলক চিরসবুজ এক নসিহত ২৩
রসূল অবমাননার শাস্তি
আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ ২৫
শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)
মাহমুদ আহমদ সুমন ২৯
মহানবী (সা.)-এর প্রতিদরূদ পড়ার ফযিলত
এনামুল হক রনি ৩১
ঈদুল আযহা ও কুরবানী
মুহাম্মদ আমীর হোসেন ৩৩
কেন আহমদী হলাম!
কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী ৩৫
বাংলার কিংবদন্তি
জার্মানীর প্রথম মিশনারী খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল ৩৮
কবিতা-
মহা মহীয়ানের চরণের তলে
জাফর আহমদ ৪০
নবীনদের পাতা ৪১ ও ৪৩
সংবাদ ৪৫
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী ৪৮

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ হজ্জ-২২

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। আর, যেসব কুরবানীর উটকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ্-নির্ধারিত পবিত্রতার প্রতীকসমূহের অন্তর্গত করে দিয়েছি, সেগুলোতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। অতএব, সারিতে দাঁড় করিয়ে সেগুলোর ওপর আল্লাহ্‌র নাম নাও। আর (জবাই করার পর) সেগুলো যখন (মাটিতে) ঢলে পড়ে, তখন তা থেকে খাও, স্বল্পে তুষ্ট (অভাবী)দেরও খাওয়াও এবং সাহায্যপ্রার্থীদেরও (খাওয়াও)[১৯৫৪]। এভাবেই তাদেরকে আমরা তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছি, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ۚ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। এগুলোর মাংস ও রক্ত কখনো আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না, বরং তোমাদের তাক্‌ওয়া তাঁর কাছে পৌঁছে[১৯৫৫]। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন, যেন তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। কারণ, তিনি তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন। আর তুমি সৎকর্ম-পরায়ণদেরকে সুসংবাদ দাও।

১৯৫৪। কুরবানীর জন্য মক্কায় উটগুলোকে যবাই করা এরূপ এক প্রতীক যে, মানুষ তার স্রষ্টা এবং প্রভুর পথে জীবন দিতে প্রস্তুত, যেমন করে উটগুলো তাদের নিজ মালিকের জন্য প্রাণ দেয়। এটাই কুরবানীর চরম উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। আয়াতে উল্লেখিত অপর উদ্দেশ্যসমূহ দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। যখন সে একটি পশুকে কুরবানী করে, তখন তা হজ্জযাত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র এক নিদর্শনস্বরূপ। এই আয়াত আরও প্রমাণ করে যে, কুরবানীকৃত পশুর গোশ্‌ত সঠিকভাবে বন্টন করা উচিত, যেন অপচয় না হয়।

১৯৫৫। তফসীরাধীন আয়াত কুরবানীর প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এর অভ্যন্তরীণ-অবস্থার ওপর সমুজ্জলভাবে আলোকপাত করেছে। এটি এই সর্বোচ্চ-শিক্ষা প্রদান করে যে, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ আল্লাহ্ তাআলাকে সন্তুষ্ট করে না, বরং এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতে তাক্‌ওয়ার প্রেরণা ও অন্তর্নিহিত-শক্তিই তাঁকে খুশী করে। কুরবানীকৃত পশুর গোশ্‌ত এবং রক্ত আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, কেবল অন্তরের তাক্‌ওয়াই তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য। তাদের নিকট প্রিয় যা-কিছু আছে, আল্লাহ্ তাআলা তার সর্বপ্রকারের কুরবানী তলব করেন এবং গ্রহণ করে থাকেন। আমাদের পার্থিব সহায়-সম্পদ, প্রিয়-ভাবাদর্শ, আমাদের সম্মান, এমনকি নিজ-জীবন পর্যন্ত এর অন্তর্ভুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ্ তাআলা পশুর রক্ত এবং গোশ্‌ত আমাদের নিকট চান না এবং আশা করেন না। কিন্তু তিনি আমাদের আত্মোৎসর্গ চান। তবে এটা মনে করা ভুল হবে যে, বাহ্যিক ক্রিয়া-অনুষ্ঠানের আড়ালে সক্রিয় মনোভাবই গুরুত্বপূর্ণ, আর সে-জন্য বাহ্যিক-কর্মানুষ্ঠানের কোন মূল্য নেই। এও সত্য যে, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়া খোলসস্বরূপ এবং এর অভ্যন্তরীণ-প্রেরণা তার শাঁস। অনুরূপভাবে, কোন বস্তুর দেহাবরণ এর শাঁস বা সারাংশের মতই অতি জরুরী। কারণ, কোন আত্মা দেহ ছাড়া থাকে না এবং কোন শাঁস খোসা ছাড়া থাকতে পারে না।

হাদীস শরীফ

প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক বছরই কুরবানী করা আবশ্যক

❑ হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, হে লোক সকল (জেনে রাখ)! প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক বছরই কুরবানী করা আবশ্যক (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

❑ হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যেব্যক্তি সামর্থ্য লাভ করেছে অথচ কুরবানীর আয়োজন করেনি, সে যেন আমাদের ইদগাহের নিকট না আসে (ইবনে মাজাহ)।

❑ হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ঈদে ধুসর রঙ্গের শিংওয়ালা দু'টি দুম্বা কুরবানী করলেন। তিনি এদেরকে আপন হাতে জবাই করলেন এবং (যবাই করার সময়) 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর' বল্লেন। আনাস (রা.) বলেন, আমি তাঁকে (যবাই করার সময়ে) উহাদের পাঁজরের ওপর নিজের পা রাখতে দেখেছি এবং 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর' বলতে শুনেছি (মুত্তাফিকুন আলায়হে)।

❑ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর নিমিত্তে বন্টনের জন্য তাকে (উকবাকে) কতগুলি ছাগল-ভেড়া দিলেন। বন্টনের পর একটি একবছর বয়সী বাচ্চা-ছাগল বাকী থাকল। তিনি তা রসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উল্লেখ করলেন। হুযূর বল্লেন, তা দ্বারা তুমি নিজে কুরবানী কর। অপর বর্ণনা মতে , আমি বল্লাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার ভাগে তো মাত্র একটি বাচ্চা-ছাগল থাকল। হুযূর (সা.) বল্লেন, তুমি তা দ্বারাই কুরবানী কর (মুত্তাফিকুন আলায়হে)।

❑ হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদগাহেই যবাই করতেন বা নহর করতেন (বুখারী)।

❑ হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন যিলহজ্জ মাসের প্রথম-দশক আসে, আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন নিজের কেশ ও চর্মের কোন কিছু স্পর্শ না করে (না কাটে) । অপর বর্ণনায় আছে, সে যেন কোন কেশ না ছাঁটে এবং কোন নখ না কাঁটে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, যে-ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং কুরবানীর ইচ্ছা রাখবে, সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখসমূহের কিছু না কাঁটে (মুসলিম)।

❑ হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন (কুরবানীর পশুর) চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নেই এবং আমরা যেন এমন পশু কুরবানী না করি যে-পশুর কানের শেষ ভাগ কাটা গেছে অথবা যার কান গোলাকারে ছেদিত হয়েছে বা যার কান পেছনের দিকে কুকড়ে গেছে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী)।

❑ হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন যে, আমরা যেন শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা পশু কুরবানী না করি (ইবনে মাজাহ্)।

❑ হযরত যায়েদ বিন আকরাম (রা.) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কুরবানী কী? হুযূর উত্তর করলেন, তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামের সুন্নত (নিয়ম)। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এতে আমাদের কি (সওয়াব) আছে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! হুযূর (সা.) বললেন, কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে। তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! পশমওয়ালা পশুদের ক্ষেত্রে কি হবে? (এদের পশম তো অনেক বেশী)। হুযূর (সা.) বললেন, পশমওয়ালা পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে (আহমদ ও ইবনে মাজাহ্)।

অমৃতবাণী

একজন প্রকৃত খোদা-প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

"আরো একটি উপাসনার নাম হচ্ছে হজ্জ। যার অর্থ এটা নয় যে, ন্যায় বা অন্যায় পথে উপার্জিত অর্থ দ্বারা কেউ সাগর পাড়ি দিয়ে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে এবং কাবার রক্ষণাবেক্ষণকারীদের নির্দেশানুযায়ী নামায ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করার পর ফিরে এসে গর্ব সহকারে বলে বেড়ায় যে, সে হজ্জ করে এসেছে। আল্লাহ্ হজ্জের যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন, তা এভাবে লাভ করা যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, হজ্জ-যাত্রীর ভ্রমণের মূল লক্ষ্য হবে, যেন সে তার সকল কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও ভক্তিতে নিমজ্জিত হয়। একজন প্রকৃত-প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে এবং আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ তারই প্রকাশ্য-রূপ" (১৯০৬ সালের সালানা জলসার ভাষণ, 'ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে এর তুলনা' হতে গৃহীত)।

"দ্বিতীয় প্রাসঙ্গিক-বিষয় হচ্ছে, এই মাস 'ত্যাগের মাস' বলে পরিচিত। হযরত রাসূল করীম (সা.) ত্যাগের উত্তম উদাহরণ দানের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। যেমনভাবে তোমরা ছাগল গরু, উট এবং ভেড়া কুরবানী দিয়ে থাক, তদ্রূপ আজ হতে তেরশ' বছর পূর্বে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পথে মানুষ নিজেদের জীবন কুরবানী করে দিত। সেটাই ছিল প্রকৃত 'বড় ঈদ' এবং ওটাই ছিল প্রকৃত-সময়, যখন জগৎকে প্রভাতের-আলো প্রদর্শন করা হয়েছিল।

বর্তমানে পশু জবাই করার মাধ্যমে যেভাবে কুরবানী করা হয়, উহা কুরবানীর শাঁস নয়, কুরবানীর খোলস মাত্র। উহা আত্মা নয়, দেহ মাত্র" (মলফুযাত, ২য় খন্ড)।

"কাবাগৃহ প্রদক্ষিণকারী হাজী নিজের সকল কাপড় ছেড়ে এক কাপড় পরিধান করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক হাজী তার সকল বাহ্যিক পোশাক পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন-হৃদয়ে আল্লাহ্‌র সন্নিধানে হাজির হয়। কারণ, তখন সে সকল শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে। একজন হাজী বাহ্যিকভাবে কাবা প্রদক্ষিণ করে দেখায় যে, তার হৃদয়ে স্বর্গীয়-প্রেমের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে এবং সে সত্যিকারের-প্রেমিকের ন্যায় তার প্রেমাস্পদের গৃহ প্রদক্ষিণ করে। প্রকৃতপক্ষে সে তার সকল কামনা-বাসনা ছিন্ন করে নিজের সকল স্বার্থ তার প্রভুর নিকট কুরবানী করে। ইসলামী-বিধানে হজ্জের প্রকৃত-অর্থ এটাই" ('ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা,' রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯০৭)

"এবং যারা হজ্জব্রত পালনে ব্রতী হয়, তাদের স্মরণ রাখা উচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হজ্জের প্রকৃত- তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তার বাহ্যিক-কর্ম আধ্যাত্মিক-হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার হজ্জব্রত পালন প্রাণহীন ও অর্থহীন। কিন্তু অনেক ব্যক্তি এমন আছেন, লোকে তাদের হাজী বলুক, এ-জন্যই অসৎ-উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা পবিত্র কাবাগৃহে গমন করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট তাদের হজ্জ গৃহিত হয় না, কেননা, তা শাঁসবিহীন খোলস মাত্র" (১৯০৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সালানা জলসার বক্তৃতা-রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯০৭)

জুমুআর খুতবা

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে অবমাননাকর চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিক্রিয়া

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২-এর (২১ তাবূক, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ○

এ আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশ্‌তারা এ নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করছেন। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং তাঁর জন্য বেশি বেশি করে শান্তি কামনা কর। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেছেন এবং তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।' (সূরা আল্ আহযাব: ৫৭-৫৮)

ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে পরিচালিত অত্যন্ত হীণ, জঘন্য এবং অন্যায় কর্মকান্ডের কারণে বর্তমানে ইসলামীক রাষ্ট্রসমূহে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের মাঝে তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে সঙ্গত ও ন্যায্য। মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের বিষয়ে একজন মুসলমানের সঠিক জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক সে মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। ইসলামের শত্রুরা মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ ও বাজে যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছে এবং এ চলচ্চিত্রে হুযূর (সা.)-কে যেরূপ চরমভাবে অপমান করার অপচেষ্টা করা হয়েছে তাতে প্রত্যেক মুসলমানের দুঃখ পাওয়া আর ক্ষুব্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

মানবদরদী, সমগ্র বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ ও আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়পাত্র মহানবী (সা.) মানুষের দুঃখে রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটিয়েছেন, মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য স্বয়ং এত বেদনা ভারাক্রান্ত হয়েছেন আর নিজেকে এমন দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করেছেন যে, স্বয়ং আরশের অধিপতি হুযূর (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, 'এরা তাদের সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক-প্রভুকে কেন চিনছে না- এ কথা ভেবে তুমি কি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে?' মহান এই মানবদরদী নবী সম্পর্কে এমন অবমাননাকর চলচ্চিত্রের জন্য একজন মুসলমানের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হওয়াই স্বাভাবিক এবং হয়েছেও তাই। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছে আহমদী মুসলমানরা। কেননা আমরা হলাম মহানবী (সা.)-এর সেই খাঁটি প্রেমিক ও দাসের মান্যকারী যিনি আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর সুমহান মর্যাদার বুৎপত্তি দান করেছেন। তাই, এ অপকর্মের জন্য আমাদের অন্তর আজ ঝাঁজরা এবং আমাদের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত। আমরা খোদার দরবারে সিজদাবনত হয়ে দোয়া করছি, হে খোদা! এসব দুরাচারীদের কাছ থেকে তুমি নিজে প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তুমি তাদের এমন উচিত শিক্ষা দাও যা পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এ যুগের ইমাম আমাদেরকে রসূল প্রেমের চেতনায় এভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, **'জঙ্গলের সাপ ও হিংস্র জীব-জন্তুর সাথে সন্ধি হতে পারে কিন্তু যারা আমাদের সম্মানিত নেতা ও অভিভাবক খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে অপমান করে অধিকন্তু হঠকারিতাও দেখায়, তাদের সাথে আমরা সন্ধি করতে পারি না।'** (পয়গামে সুলাহ্)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'মুসলমানরা এমন এক জাতি যারা তাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর সম্মানার্থে নিজেদের প্রাণ বির্সজন দেয়। তাদের রসূল (সা.)-কে দিবানিশি গালি দেয়া যাদের পেশা, যারা নিজেদের পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক ও বিজ্ঞাপনসমূহে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সাথে তাঁর নাম উল্লেখ করে এবং তাঁর জন্য চরম নোংরা শব্দ ব্যবহার করে তাদের সম্বন্ধে সুধারণা পোষণ করা ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার মত অসম্মান অপেক্ষা মৃত্যুবরণ করাকে মুসলমানরা শ্রেয় মনে করে।'** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, **'স্মরণ রাখবেন! এমন লোকেরা স্বজাতিরও শুভাকাঙ্খী নয়। কেননা তারা তাদের চলার পথে অন্তরায়। আমি সত্য সত্যই বলছি, আমাদের পক্ষে জঙ্গলের সাপ ও মরুভূমির হিংস্র জন্তুর সাথে সন্ধি করাও সম্ভব, কিন্তু আমরা এমন সব মানুষের সাথে আপোষ করতে পারি না যারা আল্লাহ্‌র নবীদের সম্পর্কে অবমাননাকর বক্তব্য দেয়া হতে ক্ষান্ত হয় না। তারা মনে করে গালমন্দ করা ও অকথ্য ভাষা ব্যবহারের মাঝে বিজয় নিহিত। বস্তুতঃ সকল বিজয় ঊর্ধ্বলোক থেকেই এসে থাকে।'** তিনি (আ.) আরো বলেছেন, **'পবিত্র ভাষী মানুষেরা অবশেষে তাদের পবিত্র ভাষণ ও কথনের কল্যাণে মানুষের মন জয় করে থাকে। কিন্তু নোংরা স্বভাবের লোকেরা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে বিভেদ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন কৌশল জানে না।'**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেছেন, **'অভিজ্ঞতাও এ কথাই বলে, নোংরা ভাষী মানুষের পরিণাম শুভ হয় না। আর অবশেষে আল্লাহ্‌র আত্মাভিমান তাঁর প্রিয়জনদের পক্ষে কার্যকর হয়।'** (চশমায়ে মা'রেফত, রূহানী খাযায়েন ২৩খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৫-৩৮৭)

বর্তমান যুগে পত্র-পত্রিকা ও বিজ্ঞাপনের পাশপাশি অন্যান্য প্রচার মাধ্যমকেও এই জঘন্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। অতএব যারা হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধাচারণ করছে নিশ্চয়ই তারা তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি পাবে, ইনশাআল্লাহ্। এরা নিজেদের হঠকারিতায় অনড় থেকে ধৃষ্টতার সাথে অত্যাচার-অনাচার চালিয়ে যাচ্ছে।

২০০৬ সালে ডেনমার্কে নোংরা প্রকৃতির লোকেরা যখন মহানবী (সা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করেছিল, তখনো আমি জামাতকে যথাযথ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তখন আমি আরও বলেছিলাম, পূর্বেও এমন সীমালঙ্ঘনকারীর জন্ম হয়েছে আর এ অপকর্মের এখানেই শেষ নয়। মুসলমানদের পক্ষ থেকে বর্তমানে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হচ্ছে এতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। বরং ভবিষ্যতেও এরা এ ধরনের কুকর্ম অব্যাহত রাখবে। আর আমরা দেখছি, এখন এরা এর চেয়েও বেশি ঘৃণ্যকর্ম ও অনাচারে লিপ্ত হয়েছে। আর তখন থেকেই এরা ধীরে ধীরে এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে চলেছে।

ইসলামের বিপক্ষে এটি হলো তাদের চরম পরাজয় যা তাদেরকে 'বাক-স্বাধীনতা'র ছত্রছায়ায় জঘন্য ও অশালীন কর্মকান্ডে ধৃষ্ট করছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'স্মরণ রেখ! এরা নিজ জাতিরও শুভাকাঙ্খী নয়। একদিন এসব জাতির কাছেও এদের কর্মের স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। এবং পরিস্কার ভাবে প্রতিভাত হবে, এরা আজ যেসব জঘন্য অপলাপে লিপ্ত তা এসব জাতির জন্যও ক্ষতিকর কেননা এরা স্বার্থপর ও অত্যাচারী। নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করা ছাড়া এদের অন্য কোন কাজ নেই।'**

বর্তমানে রাজনীতিবিদ এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরাও বাক-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কোথাও প্রকাশ্যে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইনিয়ে বিনিয়ে এদের স্বপক্ষে কথা বলছে এবং মাঝে মাঝে আবার মুসলামানদের স্বপক্ষেও বলছে। কিন্তু মনে রাখবেন! পৃথিবীটা এখন এমন এক 'বিশ্বপল্লীতে' পরিণত হয়েছে যার কারণে মন্দকে যদি দ্ব্যর্থহীনভাবে মন্দ বলা না হয় তবে এসব কথা এ দেশগুলোর শান্তি ও স্থিতিশীলতা ধ্বংস করে ফেলবে, এছাড়া আল্লাহ্‌র শাস্তির বিষয়টিতো আছেই।

যুগ-ইমামের কথা স্মরণ রাখুন! প্রতিটি বিজয়ই ঊর্ধ্বলোক থেকে প্রদান করা হয়। ঊর্ধ্বলোকে সিদ্ধান্ত হয়েই আছে আর তা হচ্ছে, তোমরা যে রসূল (সা.)-এর মানহানির অপচেষ্টা করছ, তিনি (সা.) অবশ্যই এ পৃথিবীতে বিজয় লাভ করবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী এ বিজয় মানুষের মন জয়ের মাধ্যমে অর্জিত হবে। কেননা পবিত্র কথা ও বাণীতে এক প্রকার যাদু রয়েছে। পবিত্র বাণী ও বচনের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের দরকার নেই আর জঘন্য কথার উত্তর নোংরা ভাষায় দেয়ারও প্রয়োজন নেই। এসব লোক যেসব অশালীন ও কটুকথা বলতে আরম্ভ করেছে তা

অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। আর ইহজীবনের অবসানে এসব লোককে আল্লাহ্ তা'লা শাস্তি দিবেন।

আমি যে দু'টি আয়াত পাঠ করেছি তাতেও আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, এই রসূল (সা.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করাই তোমাদের কাজ। এসব লোকের অশালীন ও অন্যায় বক্তব্য এবং হাসি-ঠাট্টার ফলে এমন মহান নবীর সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে কোন তারতম্য ঘটে না। তিনি এমন এক মহান নবী যাঁর প্রতি স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশ্‌তারাও দরূদ প্রেরণ করেন। মু'মিনদের দায়িত্ব হলো, এই নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণে রত থাকা এবং শত্রুদের অপলাপ যখন বেড়ে যায় তখন পূর্বাপেক্ষা অধিক হারে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি তুমি রহমত বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি সর্বাধিক প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী।

হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের তুমি কল্যাণমন্ডিত কর যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের কল্যাণমন্ডিত করেছিলে। নিশ্চয় তুমি সর্বাধিক প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী– অনুবাদক)। এই হলো দরূদ এবং ইনি হলেন সেই নবী (সা.), পৃথিবীতে যাঁর বিজয় অবধারিত।

কাজেই একজন আহমদী মুসলমান এমন অশ্রাব্য কথাবার্তার জন্য একদিকে ঘৃণা, দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে, অপরদিকে অপলাপকারীদের এবং নিজ নিজ দেশের নীতি নির্ধারকদের এমন অপলাপ থেকে বিরত থাকার ও বিরত রাখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। আর এটিই আমাদের করা উচিত। একজন আহমদী জাগতিকভাবে নিজের মত করে চেষ্টা প্রচেষ্টা করে, এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীকে প্রকৃত সত্য অবহিত করতে চায়, প্রকৃত সত্য কথাটি বলতে এবং মহানবী (সা.)-এর জীবন চরিতের অনিন্দ্য সুন্দর দিকগুলো তুলে ধরতে চায়। আর বিশ্ববাসীর সম্মুখে সে তার আচার-আচরণে মহানবী (সা.)-এর অনুপম জীবনাদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়ে ইসলামী শিক্ষা ও মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের বাস্তব দৃষ্টান্ত হতে আগ্রহী। তবে, যেভাবে আমি বলছিলাম, এর পাশাপাশি দরূদ ও সালাম প্রেরণের প্রতিও পূর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী হতে হবে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের উচিত, নিজের চারপাশের পরিবেশ এবং আকাশ-বাতাসকে দরূদ ও সালামে মুখরিত রাখা। নিজেদের আচার-ব্যবহারকেও ইসলামী শিক্ষার বাস্তব রূপ দিন। অতএব এ-ই হলো আকর্ষণীয় প্রতিক্রিয়া, যা আমাদের দেখাতে হবে।

এসব দুরাচারীর পরিণতি সম্বন্ধে দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, এই রসূল (সা.)-কে যারা কষ্ট দিয়েছে অথবা মহানবী (সা.)-কে লক্ষ্য করে বর্তমানে যারা খাঁটি মু'মিনদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করছে আল্লাহ্ তাদেরকে উচিত শিক্ষা দিবেন। এ পৃথিবীতে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হবে আর এ অভিসম্পাতের ফলে তারা আরো বেশি নোংরামীতে লিপ্ত হবে। আর এসব লোকের মৃত্যুর পর তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত করে রেখেছেন। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'নোংরা ভাষীদের পরিণাম শুভ হয় না।'** অতএব এসব লোক ইহজগতেই আল্লাহ্ তা'লার অভিশাপ আকারে এবং মৃত্যুর পর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিরূপে নিজেদের পরিণাম দেখবে।

অন্যান্য মুসলমানের উচিত তারা যেন আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা ও নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন অর্থাৎ তারা যেন দরূদ শরীফের মাধ্যমে তাদের দেশ, অঞ্চল ও নিজেদের চারপাশের পরিবেশ মুখরিত করে তুলেন। এটিই হলো, যথার্থ প্রতিক্রিয়া।

বর্তমানে প্রদর্শিত প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ নিজ দেশেই নিজেদেরই সম্পদে অগ্নি সংযোগ করা বা নিজ দেশের নাগরিকদের মারপিট করা অথবা মিছিল বের করে পুলিশকে বাধ্য করে নিজেদের নাগরিকের উপরই গুলি বর্ষণ করিয়ে আপনজনদেরই হত্যা করা– এসব কর্মকান্ডে কোন লাভ নেই।

পত্র-পত্রিকা ও গণমাধ্যমে যে সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে তা থেকে বুঝা যায় পশ্চিমা বিশ্বের অধিকাংশ ভদ্রলোকও এমন আচরণকে অপছন্দ ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখছেন। মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকায় এবং এখানকার সুশীল শ্রেণী এ বিষয়টি অপছন্দ করেছেন। কিন্তু যারা নেতৃস্থানীয় তারা একদিকে বলে, এটি অন্যায় আর অন্যদিকে বাক-স্বাধীনতার অজুহাতে এর সমর্থনও করে। এমন দ্বৈত-নীতি চলতে পারে না। বাক-স্বাধীনতার আইন কোন ঐশী বিধান নয়। আমি আমেরিকাতে বক্তৃতার সময় রাজনীতিবিদদের একথাও বলেছিলাম, মানব প্রণীত আইনে ত্রুটি-বিচ্যুতি আর ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে, আইন প্রণয়নের সময় কোন কোন দিক দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে, কেননা অদৃশ্য বিষয়ে মানুষের কোন জ্ঞান নেই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্যের দ্রষ্টা, তাঁর প্রণীত আইনে কোন ভুল-ভ্রান্তি হয় না। তাই আপনারা নিজেদের আইনকে এমন নিখুঁত মনে করবেন না যাতে আর কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা সম্ভব নয়। বাক-স্বাধীনতার আইন আছে ঠিকই কিন্তু কোন দেশের আইনে এবং জাতিসংঘের চার্টারেও **"কোন ব্যক্তির অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার স্বাধীনতা নেই"–** এই মর্মে কোন কথা বলা নেই। কোথাও বলা নেই, **অন্য ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করার অনুমতিও দেয়া যাবে না, কেননা এর দ্বারা জগতের শান্তি বিনষ্ট হয়, ঘৃণার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয় এবং বিভিন্ন জাতি ও ধর্মে বিভেদ বৃদ্ধি পেতে থাকে**। কাজেই বাক-স্বাধীনতার আইন যদি প্রণয়ন করতেই হয় তবে একজনের স্বাধীনতার জন্য অবশ্যই আইন প্রণয়ন করুন কিন্তু আরেকজনের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলার আইন প্রণয়ন করবেন না। জাতিসংঘও এ জন্য ব্যর্থ হচ্ছে, কেননা ব্যর্থ আইন প্রণয়ন করে তারা মনে করে, আমরা অনেক বড় কাজ সমাধা করে ফেলেছি। অথচ আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ঘোষিত আইনে বলেন, **অন্যের প্রতিমাকেও তোমরা মন্দ বলবে না,** কেননা এতে সমাজের শান্তি বিনষ্ট হয়। প্রতিমাকে তোমরা মন্দ বলবে, আর অজ্ঞতাবশে তোমাদের সর্বশক্তিমান খোদা সম্বন্ধে তারা অসঙ্গত বাক্য ব্যবহার করবে যার ফলে তোমাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হবে, মনোকষ্ট বৃদ্ধি পাবে, ঝগড়া-বিবাদ হবে, দেশে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে।

অতএব এ হলো সেই চমৎকার শিক্ষা যা ইসলামের খোদা, এ পৃথিবীর খোদা এবং বিশ্বজগতের প্রভু উপস্থাপন করেছেন। সেই খোদা এ শিক্ষা দিয়েছেন যিনি তাঁর প্রিয়পাত্র হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে পূর্ণাঙ্গীন শিক্ষাসহ জগদ্বাসীর সংশোধন এবং প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রেরণ করেছেন। আর মহানবী (সা.)-কে তিনি 'রহ্‌মতুল্লিল আ'লামীন' উপাধিতে ভূষিত করে সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহ্‌মত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন।

কাজেই পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজ, রাষ্ট্রক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ এবং রাজনীতিবিদরা একটু ভেবে দেখুন, গুটিকতক বাজে লোককে কঠোর হস্তে দমন না করে কোথাও আপনারা নিজেরাও এ বিশৃঙ্খলায় ইন্ধন যোগাচ্ছেন না তো? জনসাধারণও একটু চিন্তা করে দেখুন, অন্যের ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এবং জগতের কীট ও নোংরামিতে লিপ্ত এই ক'জন লোকের সাথে তাল দিয়ে আপনারা নিজেরাও কি জগতের শান্তি বিনষ্টে অংশীদার হচ্ছেন না?

আমরা যারা আহমদী মুসলমান, আমরা মানব সেবার কোন সুযোগ কখনও হাতছাড়া করি না। আমেরিকাতে রক্তের প্রয়োজন পড়েছে, গত বছর আমরা আহমদীরা বারো হাজার ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করে দিয়েছি। বর্তমানেও একাজ অব্যাহত আছে। আমি তাদেরকে বলেছি, আমরা আহমদী মুসলমানরা মানুষের জীবন বাঁচাতে নিজেদের রক্ত দিচ্ছি, আর তোমরা তোমাদের এসব কর্মকান্ড দ্বারা এবং সেসব নিকৃষ্ট লোকের কথায় সায় দিয়ে আমাদের অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করছ। অতএব এ হলো একজন আহমদী মুসলমান তথা খাঁটি মুসলমানের কার্যক্রম পক্ষান্তরে যারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করছে বলে আত্মপ্রসাদ নেয় ঐ হলো তাদের একশ্রেণীর অপকর্ম ।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয়, তারা ভুল প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। একথা ঠিক, তাদের কোন কোন প্রতিক্রিয়া সঠিক নয়। ভাঙচুর, জ্বালাও-পোড়াও, ঘেরাও করা, নিরীহ মানুষ হত্যা করা, কূটনীতিকদের নিরাপত্তা না দেয়া, তাদের হত্যা করা বা মারধর করা– এ সবই অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার নিষ্পাপ নবীদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা, তাঁদের সম্বন্ধে অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করা ও এ বিষয়ে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে থাকাও অনেক বড় পাপ। অন্যদের দেখাদেখি কয়েকদিন পূর্বে ফ্রান্সের একটি পত্রিকাও মাথাচাড়া দিয়েছে এবং এরা আবারও ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছে আর তা পূর্বের চেয়েও জঘন্য। এই জগতপূজারীরা ইহজগতকেই নিজেদের চূড়ান্ত প্রাপ্তি বলে মনে করে কিন্তু তারা জানে না, এই জগতই তাদের ধ্বংস ডেকে আনবে।

এ প্রসঙ্গে আমি একথাও বলতে চাই, বিশ্বের এক বিশাল অঞ্চলজুড়ে মুসলমান সরকার ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর একটি বড় অংশ মুসলমানদের অধিনস্ত। অনেক মুসলমান রাষ্ট্রকে আল্লাহ্ তা'লা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন। মুসলমান দেশগুলো জাতিসংঘেরও সদস্য। পবিত্র কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গীন জীবন বিধান– এর অনুসারীরা ও এর অধ্যয়নকারীরাও পৃথিবীতে বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন এর অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালাকে জগতের সামনে তুলে ধরতে মুসলমান রাষ্ট্রগুলো চেষ্টা করে নি বা এখনও কেন উদ্যোগ নিচ্ছে না। পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুসারে তারা কেন জগতদ্বাসীকে একথা বলছে না, ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আর আল্লাহ্‌র নবীদের অসম্মান করা কিংবা এ উদ্দেশ্যে অপচেষ্টা করা– এ সবই অপরাধ, জঘন্য অপরাধ ও পাপ বিশেষ! আর বিশ্বশান্তির জন্য এ কথাটি জাতিসংঘের শান্তি ঘোষণায় সন্নিবেশিত করা আবশ্যক : **"কোন সদস্য দেশ তার নাগরিকদেরকে ভিনধর্মীদের অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অনুমতি দিবে না। চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নামে বিশ্বের শান্তি বিনষ্ট করার অনুমতি দেয়া যাবে না।"** বড়ই আক্ষেপ! এতদিন ধরে এতকিছু ঘটছে তথাপি মহানবী (সা.) এবং বিশ্বের সকল নবী-রসূলের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে জগদ্বাসীকে অবহিত করার জন্য এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ বিষয়ে স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে কোন বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া হয় নি। যদিও জাতিসংঘের অন্যান্য সিদ্ধান্ত, যেমন মানবাধিকার ঘোষণার মত, এটিও কার্যকর হবে না, কিন্তু কমপক্ষে বিষয়টি রেকর্ডভুক্ত হয়ে যাবে। ওআইসি অর্থাৎ অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন নামক একটি প্রতিষ্ঠানের যদিও অস্তিত্ব আছে কিন্তু এর মাধ্যমে কখনো এমন কোন বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া হয় নি যার মাধ্যমে জগতে মুসলমানদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়। মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর রাজনীতিবিদরা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সব ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় রত, কিন্তু ধর্মের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি তাদের মাথায় থাকে না। আমাদের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে যদি বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া হতো তাহলে জনসাধারণের পক্ষ থেকে এসব ভুল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হতো না যা দৃষ্টান্তস্বরূপ, আজ পাকিস্তান বা অন্যান্য দেশে হচ্ছে। তারা এ কথা ভেবে নিশ্চিত থাকতে পারতো, আমাদের নেতৃত্ব এ কাজে নিয়োজিত আর তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট। এরা মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বরং সমস্ত নবী-রসূলের সম্মান প্রতিষ্ঠায় এমনভাবে আর্ন্তজাতিক ফোরামে নিজেদের দৃঢ় অবস্থান প্রদর্শন করবেন যার কারণে জগদ্বাসীকে তাদের কথা সত্য ও যথার্থ বলে মানতে হবে।

এছাড়া পাশ্চাত্যে এবং পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে বসবাসরত মুসলমানদের একটি বড় সংখ্যা রয়েছে। ধর্মীয় অবস্থান ও অনুসারী-সংখ্যার দিক দিয়ে মুসলমানরা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অবস্থানে সমাসীন। এরা যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী মান্যকারী হয় তাহলে সকল ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শক্তিতে পরিণত হতে পারে। এমতাবস্থায় ইসলামের শত্রুরা এ ধরনের মর্মপীড়াদায়ক অপকর্ম করার বা এ ধরনের চিন্তা করারও দুঃসাহস দেখাতে পারবে না।

যাই হোক, মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলো ছাড়াও পৃথিবীর প্রতিটি দেশে মুসলমানদের একটি বড় সংখ্যা বিদ্যমান। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কেবল তুর্কী মুসলমানদের সংখ্যাই লক্ষ লক্ষ। গোটা ইউরোপে নয় বরং ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় এরা বিদ্যমান। এশিয়া থেকে মুসলমানরা এসে এখানে বসবাস করছেন। এরা যুক্তরাজ্যেও আছেন আর যুক্তরাষ্ট্রেও আছেন। আবার কানাডা এবং ইউরোপের প্রত্যেক অঞ্চলেই আছেন। তারা সবাই যদি সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, আমরা আমাদের ভোট কেবল এমন ব্যক্তিবর্গকে প্রদান করব যারা ধর্মীয় সহনশীলতার প্রবক্তা। এটি কেবল বুলি সর্বস্ব হবে না বরং এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটা চাই। তারা যদি এসব দুরাচারী, অপলাপী ও চলচ্চিত্র নির্মাতার প্রকাশ্যে নিন্দা জানান তাহলে এসব বস্তুবাদী সরকারগুলোর ভেতর থেকেই এমন একটি শ্রেণী এগিয়ে আসবে যারা প্রকাশ্যে এই অশালীনতা ও জঘন্য কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে।

অতএব মুসলমানরা যদি নিজেদের গুরুত্ব অনুধাবন করেন তাহলে পৃথিবীতে একটি বিপ্লব সাধিত হতে পারে। তারা চাইলে নিজ নিজ দেশে ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আইন প্রণয়ন করতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ নিয়ে কারো কোন মাথাব্যথা নেই। একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাত এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করলেও এর বিরোধিতায় সবাই তৎপর থাকে। ফলতঃ শত্রুদেরকে আরো শক্তি যোগান দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান নেতাদের, রাজনীতিবিদদের এবং আলেম-উলামাকে স্বচ্ছ বিবেক-বুদ্ধি দান করুন যাতে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে, এরা যেন নিজেদের অবস্থান ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। নিজেদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হয়।

যারা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অযথা আপত্তি উত্থাপন ও অভিযোগ উত্থাপন করে আর যারা এই চলচ্চিত্র নির্মাণের হোতা অথবা এতে

অভিনয় করেছে তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক মান কি তা গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যাদি থেকেই সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। বলা হয়, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী একজন মিশরীয় কিবতী খ্রিস্টান। এর নাম Nakoula Basseley (নাকুলা বেসেলে বা এমন কোন নাম হবে)। কিংবা Sam Bacile নামে সে পরিচিত। যাই হোক, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, সে রীতিমত অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত এক ব্যক্তি, যার একটি Criminal Background রয়েছে। অপরাধি ব্যক্তি সে। প্রতারণার দায়ে সে ২০১০ সালে জেলও খেটেছে। আর দ্বিতীয় যে ব্যক্তি এই চলচ্চিত্রের পরিচালকের ভূমিকা পালন করেছে সে মূলতঃ 'নীল ছবির' পরিচালক। এই চলচ্চিত্রে যেসব অভিনেতা-অভিনেত্রী রয়েছে এরা সবাই নীল ছবির নায়ক-নায়িকা। এই হচ্ছে এদের চরিত্র ও নৈতিকতার অবস্থা! আর নীল ছবি যে কি জিনিস, সাধারণ মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। যারা স্বয়ং এমনসব জঘন্য নোংরামীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত তারাই আবার আপত্তি জানাচ্ছে সেই মহান অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যাঁর পবিত্র স্বভাব ও উন্নত নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা সাক্ষ্য দিয়েছেন!

অতএব এই জঘন্য অশ্লীলতা ও নোংরামীর মাধ্যমে এরা নিশ্চিতভাবে খোদা তা'লার ক্রোধ ও আযাবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আর এ অপকর্ম তারা অবিরত করে চলেছে। একইভাবে এই নীল ছবির যারা পৃষ্ঠপোষক বা স্পনসর খোদা তা'লার শাস্তি থেকে তারাও রেহাই পাবে না। এদের মাঝে একজন হলো, সেই খ্রিস্টান পাদ্রী যে বিভিন্ন সময় আমেরিকায় সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের লোভে পবিত্র কুরআন পোড়ানোর মত ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। আল্লাহুম্মা মাযিযকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহিহকহুম তাসহীকা।

কয়েকজন গণমাধ্যমে এই অপকর্মের জন্য একদিকে নিন্দা জ্ঞাপন করছে আবার একইসাথে মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রদর্শিত প্রতিক্রিয়ারও নিন্দা করছে। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই, ভুল প্রতিক্রিয়ার সমালোচনা করা উচিত। কিন্তু এ বিষয়টিও লক্ষ্য করুন, এসবের সূচনা কে করেছে?

যাই হোক, আমি একটু আগেই বলছিলাম, দুর্ভাগ্যবশতঃ এসবই মুসলমানদের মাঝে ঐক্য ও নেতৃত্ব না থাকার কারণে সংঘটিত হচ্ছে। রসূল প্রেমের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও এরা ধর্মের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। এরা মুখে বড় বড় দাবী করে কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞানের বেলায় ঠনঠন। জাগতিকভাবেও এরা দুর্বল হয়ে পড়ছে। কোন মুসলিম অধ্যুষিত দেশ অপর কোন দেশকে এখনও জোরালোভাবে প্রতিবাদ জানায় নি। জানিয়ে থাকলেও তা ছিল এত দুর্বল যে কারণে গণমাধ্যম একে কোন গুরুত্ব প্রদান করে নি। আর মুসলমানদের প্রতিবাদ সম্পর্কে কোন সংবাদ প্রকাশিত হলেও তা ছিল, **"১.৮ বিলিয়ন মুসলমান শিশুসূলভ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে।"** যখন পথ দেখানোর কেউ থাকে না মানুষ তখন দিশেহারা হয়েই ঘুরে বেড়ায়। তখন তাদের প্রতিক্রিয়া শিশুসূলভই হয়ে থাকে। এ দৃষ্টিকোন থেকে এরা (গণমাধ্যম) খোঁচাও দিয়েছে, অপরদিকে বাস্তব চিত্রও তুলে ধরেছে। দোয়া করি, মুসলমানদের এখনও যেন বোধোদয় ঘটে।

এদের ধর্মের চোখ অন্ধ, নবীদের পদমর্যাদা কী তা এরা জানেই না। এরা হযরত ঈসা (আ.)-এর মর্যাদাহানী ঘটিয়েও নিশ্চুপ থাকে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-এর জন্য যে ভালবাসা এবং আবেগের উচ্ছাস রয়েছে তা এদের কাছে শিশুসূলভ প্রতিক্রিয়াই মনে হবে। কিন্তু আমি ২০০৬ সাল থেকেই এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছি, **'এ দিকটির প্রতি দৃষ্টি দিন এবং এমন বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নিন যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের অপকর্ম ও অশালীন কাজ করার মত কেউ ধৃষ্টতা না দেখায়।'** হায়, যদি কোন মুসলমান দেশ এর প্রতি কর্ণাপাত করতো! আর যেখানে যে আহমদীর জন্য সম্ভবপর তারা যেন নিজ নিজ গন্ডিতে এই বাণী যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। কয়েকদিন প্রতিবাদ করে নিরব হয়ে গেলে এই সমস্যার সমাধান হবে না।

বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ প্রস্তাব পাঠিয়ে থাকে। এর মধ্যে একটি পরামর্শ হচ্ছে, বিশ্বের যত মুসলমান আইনজ্ঞ ও উকিল আছেন তাদের উচিত হবে সম্মিলিতভাবে একটি স্মারকলিপি জমা দেয়া। হায়, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুসলমান আইনজ্ঞ ও উকিলরা এ বিষয়টি যদি একবার খতিয়ে দেখতেন এবং এর সম্ভাব্যতা ও কার্যকারিতা যাচাই করে দেখতেন অথবা এর সম্ভাবনা ও বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনা করতেন কিংবা অন্য কোন সম্ভাব্য পথ খুঁজে বের করতেন! আর কতদিন এই নির্লজ্জতা অবলোকন করবেন আর নিজ নিজ দেশে সাময়িক প্রতিবাদ ও ভাঙচুর করেই সন্তুষ্ট থাকবেন। এধরনের প্রতিবাদে পাশ্চাত্যের বা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কিছুই যায় আসে না। এসব দেশে নিরীহ জনতার উপর আক্রমন করলে, কিংবা হুমকী দিলে অথবা মানুষ হত্যার প্রচেষ্টা চালালে বা দূতাবাসগুলোতে আক্রমন করলে–এসব কাজই হবে ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থী। কোনভাবেই ইসলাম এর অনুমতি দেয় না। এমনটি করলে আপনারা নিজেরাই মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ করে দিবেন।

অতএব উগ্রতা ও চরমপন্থা অবলম্বন এর সমাধান নয়। এর সমাধান হচ্ছে তা-ই যা আমি ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ নিজের আচার-আচরণের সংশোধন এবং মানবের মুক্তিদূত মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ, জাগতিক চেষ্টা-প্রচেষ্টায় মুসলমান দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়া, পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মুসলমানদের ভোটাধিকারের সঠিক প্রয়োগ। যাই হোক, আহমদীরা যেখানেই বসবাস করছেন– এ নির্দেশনা অনুসরণের চেষ্টা করুন। আর অ-আহমদী বন্ধুদেরকেও এ পথে পরিচালিত হতে অনুপ্রাণিত করুন যাতে তারাও এসব দেশে তাদের যে শক্তি ও ভোটাধিকার রয়েছে তার যথাযথ প্রয়োগ করে আর মহানবী (সা.)-এর জীবনির বিভিন্ন আকর্ষণীয় দিকও যেন সুন্দরভাবে তুলে ধরে।

বর্তমানে এরা বাক-স্বাধীনতার নামে বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছে। একই সাথে একথাও বলছে, ইসলাম ধর্মে নাকি মত প্রকাশের এবং কথা বলার কোন অধিকারই নেই। আর এর সমর্থনে তারা বর্তমান মুসলিম বিশ্বের উদাহরণ টেনে বলে, এসব দেশে নাগরিকদের কোন ধরনের স্বাধীনতা নেই। একথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এদের এই দুর্গতির কারণ হলো, ইসলামী অনুশাসন না মানা। এহেন বিধিনিষেধের সাথে ইসলামী শিক্ষার দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। ইতিহাস পাঠে আমরা মহানবী (সা.)-কে নিঃসঙ্কোচে ও নির্দ্বিধায় সম্বোধন করার ঘটনা জানতে পারি। কেবল তাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে শিষ্টাচার বহির্ভূত ব্যবহারের সম্মুখীন হয়েও মহানবী (সা.)-এর ধৈর্য, উদারতা ও সহনশীলতার এমনসব ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় বিশ্বে যার কোন জুড়ি নেই। আমি এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। যদিও এগুলোকে মহানবী (সা.)-এর দান-দক্ষিণার ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয় কিন্তু এসবের মাঝেই তাঁর সাথে ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের ঘটনা এবং এর বিপরীতে তাঁর সহনশীলতার বহিঃপ্রকাশও রয়েছে। হযরত জুবায়ের বিন মুত্আম (রা.) বর্ণনা করেন, **একবার তিনি হুযূর (সা.)-এর সাথে ছিলেন আর সাথে ছিল আরো অনেকেই। তিনি (সা.)**

হুনায়ন থেকে ফিরছিলেন, হঠাৎ বেদুঈনরা তাঁকে ঘিরে ফেলে। তারা তাঁর কাছে বিভিন্ন ধরনের চাহিদার কথা বলতে বলতে তাঁকে বাবলা গাছের কাছে ঠেলে নিয়ে যায় আর এর কাঁটায় তাঁর চাদর আটকে যায়। মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে যান আর বলেন, কমপক্ষে আমার গায়ের চাদর আমাকে ফিরিয়ে দাও। যদি আমার কাছে এই বন্য গাছের সমসংখ্যাক উটও থাকতো তাহলে আমি তা তোমাদের মাঝে বিলিয়ে দিতাম আর এক্ষেত্রে তোমরা আমার মাঝে কোন প্রকার কার্পণ্য, মিথ্যাচার বা ভীরুতা দেখতে পেতে না। (সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফারযুল খুমস- হাদীস নং: ৩১৪৮)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত আরেকটি হাদীস লক্ষণীয়। তিনি বর্ণনা করেন, **আমি মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে ছিলাম আর তিনি মোটা পাড়ের চাদর পরিহিত ছিলেন। একজন বেদুঈন এসে সেই চাদর ধরে এত জোরে হেঁচকা টান দেয় যার কারণে হুযূর (সা.)-এর গলায় চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে যায়। এরপর সে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আল্লাহ্ প্রদত্ত এই সম্পদ দিয়ে আমার এই দু'টি উট বোঝাই করে দিন, কেননা আপনি আমাকে আপনার নিজস্ব সম্পদ থেকেও কিছু দিচ্ছেন না আর আপনার পৈত্রিক সম্পদ থেকেও কিছু দিচ্ছেন না। একথা শুনে প্রথমে মহানবী (সা.) নিরব থাকেন এরপর বলেন, 'আল্ মালু মালুল্লাহি ওয়া আনা আবদুহু' অর্থাৎ সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্‌রই আর আমি তাঁর এক বান্দা মাত্র। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আমাকে যে কষ্ট দিয়েছ তোমার কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেয়া হবে। সে বলল, না! মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, কেন প্রতিশোধ নেয়া হবে না? সে বলল, কেননা আপনি মন্দকে মন্দ দিয়ে প্রতিহত করেন না। একথা শুনে হুযূর (সা.) হেসে ফেলেন। এরপর মহানবী (সা.) নির্দেশ দেন, এর একটি উটে যব আর অপরটিতে খেজুর বোঝাই করে দাও।** (আল্ শিফা লিকাযী আয়ায, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৭৪, ২০০২ সালে বৈরুত থেকে প্রকাশিত)

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার এই দৃষ্টান্তই মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, আর এই ব্যবহার শুধু আপনজনের সাথেই নয় বরং শত্রুদের প্রতিও প্রদর্শন করেছেন। এ হলো উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী। এর মধ্যে দয়া-দাক্ষিণ্য, ধৈর্য, সহনশীলতা আর বদান্যতার দিকও রয়েছে। আপত্তি উত্থাপনকারীরা একেতো অজ্ঞ তার উপর কোন কিছু না জেনেই হুট করে সেই রহমাতুল্লিল আ'লামীন এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বসে আর বলে, তিনি কঠোরতা দেখিয়েছেন আর তিনি অমুক অমুক দোষে দোষী।

এরপর এদের আপত্তি হলো পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে। যদিও আমি নিজে এটি দেখিনি কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি, এ চলচ্চিত্রে এই আপত্তিও তোলা হয়েছে, হযরত খাদীজাহ্ (রা.)-র চাচাতো ভাই সেই ওয়ারকা বিন নওফেল নাকি পবিত্র কুরআন লিখে দিয়েছিলেন যার কাছে মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রথম ওহী অবতীর্ণ হবার পর হযরত খাদীজাহ্ (রা.) তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় কাফিরদের এই আপত্তি ছিল, এই কুরআন যা তুমি খন্ডে-খন্ডে নিয়ে আসছ, এটি যদি আল্লাহ্‌র বাণী হয়ে থাকে তাহলে একযোগে কেন অবতীর্ণ হয় নি? কিন্তু এই বেচারারা এ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ বরং ইতিহাস সম্পর্কেও অনবহিত। যাই হোক, এই চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের চরিত্র এমনই। কিন্তু যে দু'জন পাদ্রী এই অপকর্মে জড়িত আর যারা নিজেদের বড়ই জ্ঞানী বলে মনে করে তারাও মূলতঃ এ বিষয়ে একেবারেই মুর্খ। ওয়ারকা বিন নওফেল আক্ষেপ করে বলেছিলেন, **'হায়, আমি যদি সেদিন বেঁচে থাকতাম যখন তোমাকে তোমার স্বজাতি দেশ থেকে বিতাড়িত করবে।'** এ ঘটনার কিছুদিন পর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। (সহীহ্ বুখারী, কিতাব বাদাউল ওহী, হাদীস নং:৩)

যেমনটি আমি বললাম, এই পাদ্রীরা ইতিহাস এবং বাস্তবতা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। প্রাচ্যবিদরা সর্বদা পবিত্র কুরআন নিয়ে এই বিতর্কে লিপ্ত থাকে, এই সূরা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে আর ঐ সূরা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে? মদীনায় না মক্কায়? এবার এরা এ প্রশ্ন তুলে আর বলছে, এই কুরআন নাকি তিনি লিখে দিয়েছেন! পবিত্র কুরআন স্বয়ং চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছে, যদি মনে কর, কেউ এটি লিখে দিয়েছে তাহলে এর কোন সূরার ন্যায় একটি সূরাই এনে দেখাও!

এছাড়া মানবীয় আবেগ-অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এক্ষেত্রেও মহানবী (সা.) হলেন অতুলনীয়। তিনি সব নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ তা জানা থাকা সত্ত্বেও ইহুদীর অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তিনি বলেছিলেন, আমাকে মূসার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না। (সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফিল খুসুমাতে, হাদীস নং:২৪১১)

মহানবী (সা.) দরিদ্রদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সদা দৃষ্টি রেখেছেন এবং তাদের সম্মানকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর (সা.) একজন সম্পদশালী সাহাবী একবার অন্যদের সামনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছিলেন। হুযূর (সা.) তার একথা শুনে বললেন, তুমি কি তোমার এ শক্তি-সামর্থ ও ধন-সম্পদ নিজ বাহুবলে অর্জন করেছ বলে মনে কর? কক্ষনো না। তোমাদের সামগ্রিক শক্তি ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সবই দরিদ্রদের মাধ্যমে অর্জিত হয়। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্ সিয়ার, হাদীস নং:২৮৯৬)

আজ স্বাধীনতার এই নব্য দাবীদাররা হতদরিদ্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী করে, তাদের অধিকার সংরক্ষণের (তথাকথিত) চেষ্টাও করে আর ঢোল পিটিয়ে তা ঘোষণাও করে– কিন্তু মহানবী (সা.) আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে একথা বলে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, **'তোমরা শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।'** (সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুর রহুন, হাদীস নং: ২৪৪৩)

অতএব এরা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই মানব-হিতৈষী রসূলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে? মহানবী (সা.)-এর জীবনে তাঁর উন্নত চরিত্রের অগণিত দৃষ্টান্ত আছে। এর যে কোন দিকই নিন– নির্ঘাত, আপনি মহানবী (সা.)-এর সত্তায় সেক্ষেত্রে উন্নত নৈতিক আদর্শ দেখতে পাবেন। আর কিছু খুঁজে না পেয়ে এরা অপবাদ আরোপ করে বলে, তিনি নাকি নারী-আসক্ত ছিলেন, নাউযুবিল্লাহ্। তাঁর বিয়ের ব্যাপারেও এরা আপত্তি করেছে। আল্লাহ্ তা'লা জানতেন, এমন ঘটনা ঘটবে, এসব প্রশ্ন উত্থাপিত হবে–তাই এমন এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতেন যার ফলে আপনা-আপনি এসব আপত্তির খন্ডন হয়ে যেতো।

আসমা বিনতে নু'মান বিন আবি জাওন সর্ম্পকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আরবের অন্যতম সুন্দরী নারী ছিলেন। তিনি মদিনায় আসলে, মদিনার মহিলারা তাকে দেখতে আসে আর সবাই তার প্রশংসায় বলতে আরম্ভ করে, এত সুন্দরী মহিলা আমরা জীবনে কখনও দেখি নি। তার পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী রসূল (সা.) তাকে পাঁচশ' দিরহাম মোহরানা ধার্যে বিয়ে করেন। মহানবী (সা.) প্রথমবার যখন তার কাছে যান, সেই মহিলা বলে, 'আমি আপনার কাছ থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' তিনি (সা.) এ কথা শুনে বলেন, 'তুমি এক মহান আশ্রয়দাতার দোহাই দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেছ।' একথা বলে তিনি বেরিয়ে আসেন। এরপর তাঁর এক সাহাবী আবু উসায়েদ (রা.)-কে বলেন, তাকে তার পরিবারের কাছে ফেরত দিয়ে এসো। ইতিহাসে একথাও লেখা আছে, এই বিয়েতে তার পরিবারের লোকেরা একথা

ভেবে খুবই আনন্দিত ছিল যে, আমাদের মেয়ের বিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে হয়েছে। কিন্তু তার ফিরে আসায় তারা খুবই অসন্তুষ্ট হয় এবং তাকে অনেক বকাঝকাও করে। (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, খন্ড ৮, পৃষ্ঠা: ৩১৮-৩১৯)

এই সেই মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর প্রতি নারী আসক্তির জঘন্য অপবাদ আরোপ করা হয়! অথচ তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশেই একাধিক বিয়ে করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, **'তাঁর একাধিক স্ত্রী যদি না থাকতেন আর সন্তান-সন্ততি না থাকতো, তাহলে সন্তানের কারণে যে পরীক্ষা এসেছিল, তিনি যেভাবে এর মুকাবিলা করেছেন এবং স্ত্রীদের সাথে যে সদ্ব্যবহার করেছেন এর দৃষ্টান্ত ও আদর্শ আমাদের মাঝে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতো? আমরা কীভাবে তা জানতে পারতাম? তাঁর প্রত্যেকটি কাজ খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে ছিল।'** (চশমায়ে মা'রেফাত, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ২৩, পৃষ্ঠা: ৩০০)

হযরত আয়েশা (রা.)-এর সম্পর্কেও বিভিন্ন আপত্তি রয়েছে, তিনি হুযূরের খুবই আদরের ছিলেন। তার বয়স নিয়েও অনেক আজেবাজে কথা বলা হয়। অথচ হযরত আয়েশা (রা.)-কেও কোন কোন রাতে তিনি (সা.) এ কথা বলতেন, **'আমি রাতভর আমার খোদার ইবাদত করতে চাই। কেননা তিনিই আমার সবচেয়ে বড় প্রেমাস্পদ।'** (দুররে মনসূর, ইমাম সিউতি, সূরা আদ্ দুখান, আয়াত ৪, খন্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৫০, বৈরুত থেকে প্রকাশিত ২০০১ সালের মুদ্রণ)

অতএব যাদের মাথায় নোংরামী ছাড়া আর কিছু নেই তারা এমন অপবাদ আরোপ করতেই পারে আর করছেও এবং এমন কাজ হয়তো ভবিষ্যতেও করবে, যেকথা আমি পূর্বেও বলেছি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন– এমন সব লোক দিয়ে তিনি জাহান্নাম পূর্ণ করতে থাকবেন।

এদের এবং এদের সহযোগীদের খোদা তা'লার শাস্তিকে ভয় করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয়দের জন্য বড়ই আত্মাভিমান রাখেন।'** (তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ১৫, পৃষ্ঠা: ৩৭৮)

এ যুগে তিনি তাঁর মসীহ্ ও মাহদীকে প্রেরণ করে আত্ম-সংশোধনের প্রতি জগদ্বাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু তারা যদি হাসি-বিদ্রূপ ও অন্যায় থেকে বিরত না হয় সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'লার শাস্তিও অতি কঠোর। বর্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেকটি অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে, সবদিকে বিপর্যয় আঘাত হানছে। আমেরিকাতেও ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে, আর তা পূর্বের চেয়ে আরো চরম রূপ ধারণ করছে। অর্থনৈতিক মন্দা বেড়েই চলেছে। জলবায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে জনবসতি পানির নিচে তলিয়ে যাবার আশংকা সৃষ্টি হচ্ছে। এসব বিপদ-আপদে আজ তারা পরিবেষ্টিত।

অতএব এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সীমালঙ্ঘনকারীদের উচিত খোদা তা'লার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হচ্ছে এর উল্টোটি। সীমালঙ্ঘনের অপচেষ্টা করা হচ্ছে। যুগ-ইমাম সতর্ক করে দিয়েছেন, স্পষ্টভাবে বলেছেন, জগদ্বাসী তাঁর কথায় কর্ণপাত না করলে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ বিশ্বকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেই বাণী যা বার বার পুনরাবৃত্তির যোগ্য, প্রায়ই উপস্থাপন করা হয়, আজ আমি পুনরায় সেটি তুলে ধরছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'স্মরণ রেখ! খোদা তা'লা আমাকে ব্যাপক ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়েছেন। অতএব নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ! ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যেমন আমেরিকায় ভূমিকম্প হয়েছে, তদ্রূপ ইউরোপেও হয়েছে এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও হবে। এর মধ্যে কয়েকটি কিয়ামত-সদৃশ হবে এবং এত বেশি লোক মারা পড়বে, যার ফলে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। এ মৃত্যুর কবল থেকে পশুপাখিও রেহাই পাবে না। পৃথিবীতে এত ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ দেখা দিবে যে, মানব সৃষ্টি অবধি এরূপ ধ্বংসযজ্ঞ কখনও দেখা যায় নি। অধিকাংশ স্থান লন্ডভন্ড হয়ে যাবে; দেখে মনে হবে যেন সেখানে কখনো কোন বসতিই ছিল না। এর পাশাপাশি আকাশ ও পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর বিপদাপদ দেখা দিবে, যা বুদ্ধিমানদের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হবে। জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের কোন বইয়ে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন মানুষের মধ্যে এক প্রকার আতঙ্কের সৃষ্টি হবে, পৃথিবীতে কী ঘটতে যাচ্ছে? অনেকে রক্ষা পাবে আবার অনেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন সন্নিকট বরং আমি তা তোমাদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত দেখতে পাচ্ছি। সেদিন জগদ্বাসী কিয়ামতের একটি দৃশ্য অবলোকন করবে। শুধু ভূমিকম্পই নয়, বরং আরো ভীতিপ্রদ বিপদাবলী দেখা দিবে, কতক আকাশ থেকে এবং কতক ভূপৃষ্ঠ থেকে। এটি হবার কারণ হলো, মানবজাতি আপন সৃষ্টিকর্তার ইবাদত পরিত্যাগ করেছে এবং মনপ্রাণ, সর্বশক্তি এবং সকল চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে পার্থিবতায় নিমজ্জিত হয়ে গেছে। আমার আগমন না ঘটলে এসব বিপদাবলীর প্রাদুর্ভাবে কিছুটা বিলম্ব ঘটতো। কিন্তু আমার আগমনের মাধ্যমে খোদার ক্রোধ প্রদর্শনের সেই সুপ্ত রীতি প্রকাশিত হয়ে গেছে– যা দীর্ঘকাল যাবত অন্তরালে ছিল। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,**

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

(অর্থাৎ, 'এবং আমরা রসূল না পাঠিয়ে কখনও আযাব অবতীর্ণ করি না।' সূরা বনী ইসরাঈল:১৬)

তবে অনুতাপকারীরা নিরাপদ থাকবে আর যারা বিপদ আগমনের পূর্বেই সাবধান হবে তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে। তোমরা কি এসব ভূমিকম্প ও বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছো অথবা স্বীয় প্রচেষ্টায় নিজেদের রক্ষা করতে পারবে বলে মনে করছো? কক্ষনো না। সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপের অবসান ঘটবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশও যে এসব থেকে নিরাপদ –একথা মনে করো না। আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়েও বেশি বিপদের সম্মুখীন হবে। হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও! হে এশিয়া! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি আর জনপদগুলোকে জনমানবশুন্য প্রত্যক্ষ করছি। সেই এক-অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নিরব ছিলেন এবং তাঁর চোখের সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নিরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সবাইকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে সমবেত করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্যি সত্যিই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; তওবা কর, যেন তোমাদের প্রতি করুণা করা যায়। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করে না সে জীবিত নয়, মৃত।' (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ২২, পৃষ্ঠা: ২৬৮-২৬৯)

আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীকে বিবেক- বুদ্ধি দান করুন যেন তারা ঘৃণ্য ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। আমাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা

নিজ দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে পালন করার সামর্থ দান করুন।

জুমুআর নামাযের পর আমি দু'জন শহীদের গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব। প্রথম শহীদ হচ্ছেন, জনাব সানাউল্লাহ্ সাহেবের পুত্র স্নেহের নভীদ আহমদ সাহেব। গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে তাঁকে করাচীতে শহীদ করা হয়েছে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । নভীদ আহমদ সাহেবের বংশে সর্বপ্রথম তাঁর দাদা আব্দুল করীম সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। বয়আতের পূর্বে তিনি অমৃতসরে বসবাস করতেন কিন্তু বয়আতের পর তাঁর বেশিরভাগ সময় কাদিয়ানেই কেটেছে। দেশ বিভাগের পর তাঁর পরিবারবর্গ পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের মাহমুদাবাদে বসবাস আরম্ভ করেন। তারপর ১৯৮৫ সালে করাচীতে স্থানান্তরিত হন। স্নেহের নভীদ আহমদ এর পিতা জনাব সানাউল্লাহ্ সাহেব ১৯৮৪ সালে 'আসীরানে রাহে মওলা' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে কারাবরণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

শাহাদতের ঘটনার বিবরণ হল, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ জুমুআর দিন স্নেহের নভীদ আহমদ, পিতা জনাব সানাউল্লাহ্ সাহেব– যার বয়স ছিল ২২ বছর। তিনি হামিরা টাউনের গুলশান জামী হালকায় অবস্থিত নিজ বাড়ির সামনে অ-আহমদী দু'জন পাঠান বন্ধুর সাথে বসে ছিলেন তখন অজ্ঞাত পরিচয় দুই ব্যক্তি মোটর সাইকেলে করে এসে এই তিন যুবককে লক্ষ্য করে ক্লাশনকোফ ও রিপিটার রিভলভর দিয়ে গুলি বর্ষণ করে। ক্লাশনকোফ থেকে ছোড়া দু'টি গুলি স্নেহের নভীদ আহমদ এর পেটে বিদ্ধ হয় অপর দুই যুবকের শরীরেও গুলি লাগে যারফলে এই তিন জনই আহত হন। তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু মারাত্মকভাবে আহত হবার কারণে হাসপাতালে নেয়ার পথেই স্নেহের নভীদ আহমদ ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তিনি অত্যন্ত সরলমনা, সাদাসিদে, কোমলমতি, নম্রভাষী, সহানুভূতিশীল, আনুগত্যকারী এবং বিনয়ী স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। পড়াশুনার অনেক ইচ্ছে ছিল কিন্তু দারিদ্রের কারণে মাধ্যমিকের পর আর লেখাপড়া করতে পারেন নি। পিতার সাথে কাজ করতেন, কাজের ফাঁকেই তিনি প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে মাধ্যমিক পাশ করেন। এই রমযানেও তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার অধীনে ডিউটি করেন। অধিকাংশ সময় নিজ থেকেই ডিউটির জন্য নাম লেখাতেন আর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতেন। যেখানে তিনি কাজ করতেন, সেখানকার সহকর্মী ও কর্মকর্তারাও তাঁর আচার-ব্যবহার এবং বিশ্বস্ততা দেখে খুবই প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর নামাযে জানাযায়ও অফিসের অনেকেই অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া তাঁর কোম্পানির মালিক ও পরিবারের সদস্যরাও শহীদের বাসায় সমবেদনা জানানোর জন্য আসেন। তার পিতা-মাতা দু'জনই জীবিত আছেন, আর দু'ভাই ও দু'বোন রয়েছেন।

দ্বিতীয় জানাযা হচ্ছে, জনাব মুহাম্মদ আহমদ সিদ্দিকী সাহেবের পুত্র জনাব রিয়ায আহমদ সাহেবের। পরদিনই অর্থাৎ ১৫ সেপ্টেম্বর তাঁকেও করাচীতে শহীদ করা হয়। করাচীতে টার্গেট কিলিং এর মাধ্যমে অনেক আহমদীকে শহীদ করা হচ্ছে। তাদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা করাচীর আহমদীদেরকে যেন স্বীয় নিরাপত্তার চাদরে আবৃত রাখেন। বর্তমানে টার্গেট করে করে সবচেয়ে বেশি শহীদ করা হচ্ছে করাচীতে। আর প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করা হচ্ছে পাঞ্জাবে। যাই হোক, সর্বত্র সব আহমদীদের আল্লাহ্ তা'লা নিরাপদ রাখুন।

শহীদ মুকাররম মুহাম্মদ আহমদ সিদ্দিকী সাহেবের পরিবার করাচীর অধিবাসী। তাঁর ভাই ইমরান সিদ্দিকী সাহেবের বয়আতের মাধ্যমে শহীদের পরিবারে আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়। ইমরান সিদ্দিকী সাহেব ২০০১ সালে আমেরিকাতে বয়আত গ্রহণ করে জামাতভূক্ত হন। এরপর ইমরান সিদ্দিকী সাহেবের তবলীগে তাঁর অপর দু'ভাই উমায়ের সিদ্দিকী এবং রিযওয়ান সিদ্দিকী বয়আত গ্রহণ করেন এরপর পিতা-মাতাসহ পুরো পরিবারই বয়আত গ্রহণ করে জামাতে অন্তর্ভূক্ত হন।

শাহাদতের বিবরণ হল, ২০১২'র ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখ রোজ শনিবার রাত আনুমানিক ১২টার সময় মুহাম্মদ আহমদ সিদ্দিকী সাহেব তাঁর ভগ্নিপতি জনাব মালেক শামস ফাখরী সাহেবের সাথে গুলিস্তান জওহারে অবস্থিত নিজের ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর 'আসসালাম সুপার ষ্টোর' থেকে মোটারসাইকেল যোগে রওয়ানা হন। কিছু দূর যেতে না যেতেই তাদের উপর এলোপাথারি গুলি বর্ষণ শুরু হয়। এ সময় দু'টি গুলি জনাব মুহাম্মদ আহমদ সিদ্দিকী সাহেবের দেহে বিদ্ধ হয়, যার মধ্য হতে একটি তাঁর হৃদপিন্ডে এবং অপরটি কটিদেশে বিদ্ধ হয় যারফলে ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদত বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তাঁর ভগ্নিপতি জনাব মালেক শামস ফাখরী সাহেবের শরীরের বিভিন্ন স্থানে পাঁচ'টি গুলি বিদ্ধ হয় এর মধ্যে একটি গুলি ডান কাঁধে, একটি পেটে আর বাদবাকি পায়ে বিদ্ধ হয়, বর্তমান তিনি আগা খাঁন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার আরোগ্যের জন্য দোয়া করুন– আল্লাহ্ তা'লা যেন তাকে শীঘ্র পূর্ণ আরোগ্য দান করেন।

শাহাদতের সময় শহীদ মরহুমের বয়স ছিল ২৩ বছর। মাত্র এক সপ্তাহ আগে তাঁর নিকাহ্ হয়েছিল। শহীদ মরহুম গত বছরই এমবিএ পাশ করেছেন। অত্যন্ত ভদ্র, নিরিহ, অনুগত এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে ২৩ বছরের এই যুবক কেবল সুদর্শনই ছিলেন না বরং সুচরিত্রেরও অধিকারী ছিলেন। সব সময় কয়েকটি দোয়া নিজের কাছে লিখে রাখতেন আর সর্বদা এগুলো পাঠ করতেন। তাঁর ভাই বলেন, আমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে যোগ্য ছিল। গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে কয়েকজন বন্ধুর কাছে তিনি মোবাইলে এসএমএস পাঠান, 'করাচীর অবস্থা খুবই খারাপ, আমি যদি শহীদ হয়ে যাই তবে আমার জন্য দোয়া কোরো।'

এই কষ্টদায়ক অবস্থার সময় শহীদ মরহুমের মা বলেন, অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন ও মহিলারা সমবেদনা জানানোর জন্য এসে আমাকে খোঁচা মেরে বলে, পরিণতি দেখলেন তো? এর উত্তরে শহীদ মরহুমের মা তাদেরকে বলেন, 'আমরা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মসীহ্'কে মেনেছি, আমরা কাউকে ভয় করি না। আমি জামাতের খাতিরে আমার নয় সন্তানের সবাইকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছি।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় শহীদ মরহুমের ভাই-বোন সবাই দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন। শহীদ মরহুমের পিতা পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। শহীদ মরহুম মৃত্যুকালে বৃদ্ধা মা ছাড়াও আট ভাই এবং দু'বোন রেখে গেছেন। তিনি ভাই-বোনদের মাঝে সবার ছোট ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন। এসব শহীদের সাথে আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমাসূলভ আচরণ করুন আর শোক সন্তপ্ত পরিবারের সবাইকে ধৈর্য এবং দৃঢ়তা দান করুন আর পাকিস্তানের সকল আহমদীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

জাতিসমূহের মাঝে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সুসম্পর্কই
বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ

২৭ জুন ২০১২ ওয়াশিংটন ডিসি-র **'ক্যাপিটল হিল'** (কংগ্রেস ভবন)-এ প্রদত্ত
নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা **হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)**-এর ভাষণ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,
আপনাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক।

আপনারা সময় বের করে আমার বক্তব্য শুনতে এসেছেন– তাই প্রথমেই আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমাকে এমন একটি বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে যা অত্যন্ত ব্যাপক। এর বহুবিধ দিক রয়েছে। তাই আমার পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে বিষয়টির খুঁটিনাটি তুলে ধরা সম্ভব নয়। আর যে বিষয়ে আমাকে বলতে বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে 'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়'। আজকের পৃথিবীর জন্য নিঃসন্দেহে এটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য একটি বিষয়। সময়ের স্বল্পতার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি "জাতিসমূহের মাঝে সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে পারস্পরিক সুসম্পর্ক রচনায় ইসলামী শিক্ষা"-এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য তুলে ধরবো।

প্রকৃতপক্ষে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অর্জিত হতে পারে না। আর এই নীতিটি জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রই অনুধাবন করেন। নৈরাজ্য সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর কিছু মানুষ ছাড়া কেউ একথা দাবী করে বলতে পারে না, অমুক সমাজে বা দেশে অথবা গোটা পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করছে। এতদসত্ত্বেও, আমরা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির রাজত্ব বিরাজ করতে দেখছি। বিভিন্ন দেশের ভেতরে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এমন নৈরাজ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। সব সরকারের পক্ষ থেকে ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে তাদের নীতি নির্ধারণের দাবী থাকা সত্ত্বেও এই বিশৃঙ্খলা

হুযূর (আই.)-কে কংগ্রেসম্যান ব্র্যাড শেরম্যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা প্রদান করছেন

ও বিবাদ বিদ্যমান। অথচ সবাই দাবী করে বলে, শান্তি প্রতিষ্ঠাই হলো তাদের মূল লক্ষ্য! কিন্তু সার্বিক দৃষ্টিতে, বিশ্বে যে অস্থিরতা এবং উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছে আর এর ফলে যে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ছে– এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়, এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের কোন পর্যায়ে ন্যায়-নীতিকে বিসর্জন দেয়া হয়েছে। তাই যেখানে বা যখনই বৈষম্য চোখে পড়ে তা দূর করা এবং এ উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করা একান্ত অপরিহার্য। আর তাই নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান হিসেবে, ন্যায়ের ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা ও শান্তি অর্জনের উপায় সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পূর্ণভাবে একটি ধর্মীয় সংগঠন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হলো, যে মসীহ্ এবং সংস্কারকের এ যুগে আবির্ভাবের ও বিশ্বকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় আলোকিত করার কথা ছিল, তিনি সত্যিই এসে গেছেন। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-ই হলেন সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও সংস্কারক। আর এ কারণে আমরা তাঁকে গ্রহণ করেছি। আমরা তাঁর শিক্ষার আলোকে পবিত্র কুরআনের অনুশাসন মেনে চলি আর ইসলামের সেই প্রকৃত ও খাঁটি শিক্ষার প্রচার করি যার ভিত্তি হলো পবিত্র কুরআন। তাই শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন প্রসঙ্গে আমি যা বলবো তা হবে কুরআনের শিক্ষার আলোকে।

বিশ্বে শান্তি অর্জনের লক্ষ্যে আপনারা সকলে নিয়মিতভাবে অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন এবং নিঃসন্দেহে অনেক উদ্যোগও নেন। আপনাদের সৃজনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত মন-মানসিকতা আপনাদেরকে মহৎ ধ্যান-ধারণা, পরিকল্পনা এবং শান্তি স্থাপনের বিভিন্ন রূপরেখা উপস্থাপনে সহায়তা করে। তাই এ বিষয়ে জাগতিক বা রাজনৈতিক আঙ্গিকে আমার বলার প্রয়োজন নেই, বরং ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় তা-ই হবে আমার আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। আর আগেই বলেছি, এ উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক-নির্দেশিকা উপস্থাপন করবো।

একথা সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক, মানবীয় জ্ঞান ও মেধা ত্রুটিমুক্ত নয়, বরং এর অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত নেয়ার বা চিন্তা-ভাবনার রূপরেখা নির্ধারণের সময়, প্রায়শই নির্দিষ্ট কিছু বিষয় মানব হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করে বিচার ক্ষমতাকে কলুষিত করে দিতে পারে এবং এর পরিণতিতে মানুষ তার ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে লিপ্তও হতে পারে। চূড়ান্ত পর্যায়ে এটি অন্যায় ফলাফল নির্ধারণ ও অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌র আইন নিখুঁত; হীন স্বার্থসিদ্ধি বা অন্যায্য কোন উপকরণই এতে থাকে না। এর কারণ হলো, আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির জন্য কেবল মঙ্গলই কামনা করে থাকেন আর তাই তাঁর আইন হলো সম্পূর্ণভাবে ন্যায্য। পৃথিবীর মানুষ যেদিন এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, সেদিন প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তির ভিত রচিত হবে। অন্যথায়, বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলস জাগতিক প্রচেষ্টা পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও এগুলো কোন কার্যকর ফলাফল বয়ে আনতে পারছে না বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে, কয়েকটি দেশের নেতারা ভবিষ্যতে বিশ্বের সকল জাতির মাঝে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে 'লীগ অব্ নেশন্‌স্' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মূল লক্ষ্য ছিল, বিশ্বজুড়ে শান্তি বজায় রাখা এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধ প্রতিহত করা। দুঃখজনকভাবে, এর সংবিধান ও প্রস্তাবাবলীতে এমন কিছু ত্রুটি এবং দুর্বলতা ছিল যা সমভাবে সকল মানুষ ও সকল জাতির অধিকার সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়। আর এ কারণেই অনেক দেশ একের পর এক 'লীগ' থেকে সরে পড়তে আরম্ভ করে। এতে বিরাজমান সেই অসাম্যের কারণে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি অর্জন সম্ভব হয় নি। 'লীগের' প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং এটা পৃথিবীকে সরাসরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে ঠেলে দেয়। আমরা সবাই এই বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে অবহিত। এতে বিশ্বজুড়ে প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল, যাদের অনেকেই ছিল বেসামরিক নিরীহ জনসাধারণ।

এই যুদ্ধ বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট সাব্যস্ত হওয়া উচিত ছিল। এটি ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে সকল পক্ষের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করে এমন বিচক্ষণ নীতি-নির্ধারণের উপলক্ষ হওয়া উচিত ছিল যা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি উপকরণ সাব্যস্ত হতে পারতো। তৎকালীন বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উদ্যোগ নেয় আর এভাবে 'জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু অচিরেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায়, যে মহান লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল তা আজও অর্জিত হয় নি। ইদানিং কয়েকটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অকপট বিবৃতি নিঃসন্দেহে এর ব্যর্থতা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে।

প্রশ্ন হলো, ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনকল্পে আর শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইসলামের ভাষ্য কি? পবিত্র কুরআনের ৪৯ নম্বর সূরার ১৪ নম্বর আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ একথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, মানুষে মানুষে জাতিগত ভিন্নতা বা কৃষ্টিগত পার্থক্য আমাদের পরিচিতির একটি মাধ্যম মাত্র,

কিন্তু এটি কারও উপর অন্য কারও শ্রেষ্ঠত্ব কোনভাবেই সাব্যস্ত বা প্রদান করে না। কুরআন স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে, সকল মানুষ জন্মগতভাবে সমান। উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর শেষ ভাষণে সকল মুসলমানকে চিরকাল একথা স্মরণ রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, একজন আরববাসী একজন অনারবের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়, আবার একজন অনারবও একজন আরবের উপর কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না। তিনি আরও বলেছেন, একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ একজন কৃষ্ণাঙ্গের তুলনায় কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিও একজন শ্বেতাঙ্গের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়। অতএব সকল জাতি ও সকল বর্ণের মানুষ সমান– এটিই ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষা। আর একথাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সকল মানুষকে বৈষম্য ও পক্ষপাতমুক্তভাবে সম-অধিকার প্রদান করা উচিত। এটিই হচ্ছে বিভিন্ন দল ও জাতির মাঝে সম্প্রীতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল পন্থা ও অপরিহার্য সূত্র।

কিন্তু আজ আমরা শক্তিশালী এবং দুর্বল জাতিসমূহের মাঝে পারস্পরিক বিভেদ ও বৈষম্য দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ, জাতিসংঘে বিভিন্ন দেশের মাঝে আমরা বৈষম্য লক্ষ্য করি। অনুরূপভাবে, নিরাপত্তা পরিষদে কিছু 'স্থায়ী' সদস্য আছে আবার কিছু আছে 'অস্থায়ী'। এই বিভাজন উদ্বেগ ও হতাশার আভ্যন্তরীণ একটি কারণ হিসেবে প্রমাণিত আর এজন্য আমরা প্রায়শই কয়েকটি দেশকে এই অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর দেখতে পাই।

ইসলাম ধর্ম সকল ক্ষেত্রে নিখাদ ন্যায় প্রতিষ্ঠার ও সাম্যের শিক্ষা দেয়। আমরা পবিত্র কুরআনের ৫ নম্বর সূরার ৩ নম্বর আয়াতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেখতে পাই। এই আয়াতে বলা হয়েছে, ন্যায়ের দাবী সমুন্নত রাখতে হলে এমন লোকদের সাথেও ন্যায্য ও সাম্যের আচরণ করা আবশ্যক যারা ঘৃণা ও শত্রুতা প্রদর্শনে সকল সীমা অতিক্রম করে। আর পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো, যেখানে যে-ই তোমাদেরকে কল্যাণ ও পুণ্যের দিকে আহ্বান করে তোমাদের তা গ্রহণ করা উচিত। আর যে-ই যেক্ষেত্রে পাপ ও অন্যায় করতে তোমাদের পরামর্শ দেয়, তোমাদের তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন দাঁড়ায়, ইসলাম যে

কংগ্রেসম্যান মাইক হোন্ডা (সিএ-১৫) হুযূর (আই.)-এর সম্মানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করছেন

ন্যায়পরায়ণতার কথা বলে, এর মানদন্ড কী? পবিত্র কুরআনের ৪ নম্বর সূরার ১৩৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, কাউকে যদি তার নিজের বিরুদ্ধে বা তার পিতামাতার বিরুদ্ধে বা তার সবচেয়ে প্রিয় কারও বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে হয়, ন্যায়-নীতি এবং সত্যকে সমুন্নত রাখার জন্য তার একাজ করা উচিত।

নিজেদের অধিকারের নামে শক্তিশালী ও উন্নত দেশগুলোর পক্ষ থেকে দরিদ্র ও দুর্বল দেশগুলোর প্রাপ্য অধিকার খর্ব করা উচিত নয়, আর দরিদ্র জাতিগুলোর প্রতি অন্যায় আচরণ করা থেকেও তাদের বিরত থাকা উচিত। পক্ষান্তরে, দরিদ্র ও দুর্বল জাতিগুলোর উচিত, তারা যেন শক্তিশালী বা উন্নত জাতিগুলোর ক্ষতিসাধনের সুযোগ সন্ধান না করে। বরং, উভয় পক্ষেরই ন্যায়-নিষ্ঠার নীতিমালা মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত। সত্যিকার অর্থে, এটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় শান্তি-সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আরেকটি শর্তের কথা পবিত্র কুরআনের ১৫ নম্বর সূরার ৮৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে। তা হচ্ছে, কোন পক্ষই যেন অপরের সম্পদ ও বিত্তের প্রতি ঈর্ষার বা লোভাতুর দৃষ্টিতে না তাকায়। একইভাবে, এক দেশের পক্ষ থেকে আরেক দেশকে সহায়তা বা সমর্থন দানের মিথ্যা অজুহাতে তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস বা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করা উচিত নয়। অনুরূপভাবে, অন্যের দুর্বলতার সুযোগে রাষ্ট্রসমূহকে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের নামে তাদেরকে ভারসাম্যহীন ব্যবসায়িক লেনদেন বা চুক্তিতে বাধ্য করা উচিত নয়। একইভাবে, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির বা সহায়তা প্রদানের নামে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে উন্নয়নশীল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সম্পত্তি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার ফন্দি আঁটা উচিত নয়। নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদ কিভাবে যথাযথ ব্যবহার করতে হয় তা স্বল্প-শিক্ষিত সমাজ বা সরকারকে শেখানো উচিত। জাতি এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো, সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীকে সেবা ও সাহায্য প্রদান করা। তবে এই ধরনের সেবা জাতীয় বা রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য বা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যেন না হয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গত ছয় বা সাত দশক ধরে জাতিসংঘ দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নে সাহায্য করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এই প্রচেষ্টায় তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্ঘাটন করেছে। এত সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন দরিদ্র দেশই উন্নত বিশ্বের সমপর্যায়ে উপনীত হতে পারে নি। এর অন্যতম একটি কারণ হলো, এসব দরিদ্র দেশের শাসকদের ব্যাপক দুর্নীতি। যদিও দুঃখের সাথে আমাকে বলতে হচ্ছে, উন্নত দেশগুলো তাদের নিজেদের স্বার্থে এরপরও এসব সরকারের সাথে লেনদেন অব্যাহত রেখেছে। এদের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন, আন্তর্জাতিক সাহায্য এবং ব্যবসায়িক চুক্তির ধারা অব্যাহত থেকেছে। এর ফলে, সমাজের সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীর মাঝে হতাশা এবং অস্থিরতা ক্রমাগতভাবে বেড়েছে যা এসব দেশে বিদ্রোহ ও আভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্র

জনগণ এত বেশী হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, যার ফলে তারা কেবল নিজেদের নেতাদের বিরুদ্ধেই ক্ষুব্ধ নয় বরং পশ্চিমা দেশগুলোর বিরুদ্ধেও তারা ভীষণ চটে আছে। এমতাবস্থায়, চরমপন্থী দলগুলোর হাত শক্তিশালী হচ্ছে– যারা এই হতাশার সুযোগ নিয়ে এসব হতাশাগ্রস্ত লোককে তাদের দলে ভিড়াতে চেষ্টা করছে এবং তাদের ঘৃণা-সর্বস্ব মতবাদের পক্ষে সমর্থন আদায়ে সক্ষম হচ্ছে। এর চূড়ান্ত পরিণতিতে বিশ্ব শান্তি ধ্বংস হয়ে গেছে।

ইসলাম আমাদের মনোযোগ শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়-উপকরণের প্রতি আকর্ষণ করে। এজন্য চাই অকৃত্রিম ন্যায়পরায়ণতা। এর জন্য সবসময় সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা অপরিহার্য। আমরা যেন অন্য কারও সম্পদের প্রতি লোভের দৃষ্টিতে না তাকাই– এটি হলো এর দাবী। উন্নত দেশগুলো তাদের স্বার্থসিদ্ধির চিন্তা-ভাবনা পরিহার করে নিঃস্বার্থ সেবার চেতনা ও প্রেরণা নিয়ে

১১৯ জন উপস্থিত শ্রোতার মাঝে ছিলেন সিনেটর, কংগ্রেস সদস্য, কূটনীতিক ও নীতি-নির্ধারকবর্গ

অনুন্নত ও দরিদ্র জাতিসমূহের সাহায্য ও সেবা করবে, এটিই এর দাবী। এসব দিক যদি মেনে চলা হয় কেবল তবেই সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

স্মরণ রাখবেন, অন্যায় ও অবিচার বিরাজমান থাকলে কখনই শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। অতএব কোন দেশ যদি সকল ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে এবং অন্য আরেক দেশকে আক্রমণ করে ও অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ করায়ত্ত করতে চায়, তাহলে এই নিষ্ঠুরতা থামানোর জন্য অন্য দেশগুলোর অবশ্যই পদক্ষেপ নেয়া উচিত। কিন্তু এ কাজে তাদেরকে সর্বদা ন্যায়-নীতির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ইসলামী শিক্ষানুসারে যে সব পরিস্থিতিতে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তা সবিস্তারে কুরআনের ৪৯ নম্বর সূরার ১০ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত আছে। পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেয়, যখন দু'টি জাতি পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয় আর বিবাদ যুদ্ধে পর্যবসিত হয়, তখন অন্যান্য সরকারের উচিত তাদেরকে সংলাপ এবং দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট আলোচনার প্রতি জোরালোভাবে আহ্বান জানানো, যেন তারা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা নিষ্পত্তি করে একটি সন্ধি বা মিমাংসায় উপনীত হতে পারে। তবে যদি কোন এক পক্ষ চুক্তির শর্ত মেনে না নেয় এবং যুদ্ধ আরম্ভ করে, তাহলে আগ্রাসীকে থামানোর জন্য অন্য দেশগুলোর সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করা উচিত। আগ্রাসী জাতি যখন পরাজিত হয় এবং সে পারস্পরিক আলোচনায় বসতে সম্মত হয়, তখন সকল পক্ষের এমন একটি মিমাংসায় উপনীত হবার জন্য কাজ করা উচিত যা দীর্ঘমেয়াদী শান্তি এবং মিমাংসার পথ সুগম করবে। কোন জাতিকে শেকলাবদ্ধ করার জন্য তার বিরুদ্ধে কঠোর ও অন্যায় কোন শর্ত আরোপ করা উচিত নয়। কেননা এর দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল হলো অস্থিরতা, যা আরো বীভৎস রূপধারণ করবে এবং বিস্তৃত হবে। পরিণামে ছড়িয়ে পড়বে আরও নৈরাজ্য।

তৃতীয় কোন সরকার যদি বিবদমান দুই পক্ষের মাঝে মিমাংসার চেষ্টা করে, তার উচিত পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করা। আর এই নিরপেক্ষতা তখনও বিদ্যমান থাকতে হবে যখন কোন এক পক্ষ এর বিরুদ্ধাচরণ করে। এমন পরিস্থিতিতেও তৃতীয় পক্ষের কোন প্রকার ক্ষোভ প্রকাশ করা উচিত নয় বা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে অথবা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে কোন কাজ করা উচিত নয়। সকল পক্ষকে তাদের যথাযথ অধিকার প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। শান্তি প্রক্রিয়ায় যেসব দেশ ন্যায়বিচারের দাবী পূরণের লক্ষ্যে মধ্যস্থতা করে, তাদের উচিত নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করা বা অন্যায়ভাবে উভয় দেশের কাছ থেকে অন্যায্য সুযোগ-সুবিধা আদায় বা এ লক্ষ্যে অন্যায়ভাবে চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকা। অন্যায় হস্তক্ষেপ বা কোন পক্ষের উপর অন্যায়ভাবে চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়। কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করার সুযোগ নেয়া উচিত নয়। দেশগুলোর বিরুদ্ধে অনাবশ্যক এবং অন্যায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত নয়। কেননা এটি একদিকে সঠিকও নয় আবার আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নয়নে এটি সহায়ক ভূমিকাও পালন করে না।

সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে আমি এ বিষয়গুলো অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম। এক কথায়, আমরা যদি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে বৃহত্তর স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থকে ত্যাগ করতে হবে এবং এর পরিবর্তে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত গড়তে হবে বিশুদ্ধ ন্যায়পরায়ণতার উপর। অন্যথায়, আপনারা অনেকেই এ বিষয়ে একমত হবেন, অদূর ভবিষ্যতে নতুন নতুন জোট ও ব্লক তৈরি হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বরং এভাবে বলা উচিৎ, এ প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে যার ফলশ্রুতিতে নৈরাজ্য বৃদ্ধি পেতে পেতে এক পর্যায়ে এটি এক বিপুল ধ্বংসযজ্ঞের রূপ লাভ করতে পারে। এরকম ধ্বংসযজ্ঞ ও যুদ্ধের কুফল নিশ্চিতভাবে প্রজন্ম-পরম্পরায় প্রকাশিত হতে থাকবে। তাই বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত, প্রকৃত ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। সে সব মহৎ লক্ষ্যে কাজ করা উচিত যা আমি ইতোমধ্যে বর্ণনা করে এসেছি। এমনটি করলে জগদ্বাসী সবসময় আপনাদের এই মহান প্রচেষ্টাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। আমি দোয়া করি, আমার এই আশা যেন বাস্তব রূপ লাভ করে (আমীন)। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।

ভাষান্তর: **মহিউদ্দীন অভি** (আমেরিকা)
পরিমার্জন ও সংশোধন: **কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক**

উক্ত অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিলেনঃ

1. U.S. Senator Robert Casey, Sr. (Democrat Pennsylvania)

2. U.S. Senator John Cornyn (Republican Texas)

3. Democratic Leader Nancy Pelosi (Democrat California)

4. U.S. Congressman Keith Ellison (Democrat Minnesota)

5. U.S. Congressman Bradley Sherman (Democrat California)

6 U.S. Congressman Frank Wolf (Republican Virginia)

7. U.S. Congressman Michael Honda (Democrat California)

8. U.S. Congressman Timothy Murphy (Republican Pennsylvania)

9. U.S. Congresswoman Jeannette Schmidt (Republican Ohio)

10. U.S. Congresswoman Janice Hahn (Democrat California)

11. U.S. Congresswoman Janice Schakowsky (Democrat Illinois)

12. U.S. Congresswoman Jackie Speier (Democrat California)

13. U.S. Congresswoman Zoe Lofgren (Democrat California)

14. U.S. Congresswoman Sheila Jackson Lee (Democrat Texas)

15. U.S. Congressman Gary Peters (Democrat Michigan)

16. U.S. Congressman Thomas Petri (Republican Wisconsin)

17. U.S. Congressman Adam Schiff (Democrat California)

18. U.S. Congressman Michael Capuano (Democrat Massachusetts)

19. U.S. Congressman Howard Berman (Democrat California)

20. U.S. Congresswoman Judy Chu (Democrat California)

21. U.S. Congressman André Carson (Democrat Indiana)

22. U.S. Congresswoman Laura Richardson (Democrat California

23. U.S. Congressman Lloyd Poe (Republican Texas)

24. U.S. Congressman Barney Frank (Democrat Massachusetts)

25. U.S. Congressman. Bruce Braley (Democrat Iowa)

26. U.S. Congressman Dennis Kucinich (Democrat Ohio)

ক্যাপিটল হিল-এর কর্মকর্তারা হুযূর (আই.)-কে কংগ্রেস ভবন ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন

27. U.S. Congressman Trent Franks (Republican Arizona)

28. U.S. Congressman Chris Murphy (Democrat Connecticut)

29. U.S. Congressman Hank Johnson (Democrat Georgia)

30. U.S. Congressman James Clyburn (Democrat South Carolina)

31. His Excellency Bockari Kortu Stevens, Ambassador of Sierra Leone to the United States

32. Dr. Katrina Lantos Swett, Chairwoman, United States Commission on Inteternational Religious Freedom

33. Hon. Tim Kaine, Former Governor of Virginia

34. Amb. Susan Burk, Special Representative of President Barack Obama for Nuclear Nonproliferation

35. Amb. Suzan Johnson Cook, U.S. Ambassador at Large for International Religious Freedom

36. Hon. Khaled Aljalahma, Deputy Chief of Mission, Embassy of the Kingdom of Bahrain to the United States

37. Rev. Monsignor Jean-Francois Lantheaume, First Counselor (Deputy Chief of Mission), The Apostolic Nunciature of the Holy See to the United States

38. Ms. Sara Al-Ojaili, Public Affairs/Liaison Officer, Embassy of the Sultanate of Oman to the United States

39. Mr. Salim Al Kindie, First Secretary, Embassy of the Sultanate of Oman to the United States

40. Ms. Fozia Fayyaz, Embassy of Pakistan to the United States

41. Hon. Saida Zaid, Counselor, Embassy of Morocco to the United States

42. Hon. Nabeel Munir, Minister-IV (Security Council), Pakistan Permanent Mission to the United Nations

43. Hon. Josef Renggli, Minister-Counselor, Embassy of Switzerland to the United States

44. Hon. Alyssa Ayres, Deputy Assistant Secretary for South and Central Asia, U.S. Department of State

45. Amb. Karl Inderfurth, Senior Adviser and Wadhwani Chair in U.S.-India Policy Studies, Center for Strategic and International Studies

46. Hon. Donald A. Camp, Senior Associate, Center for Strategic and International Studies

47. Amb. Jackie Wolcott, Executive Director, U.S. Commission on International Religious Freedom

48. Dr. Azizah al-Hibri, Commissioner, U.S. Commission on International Religious Freedom

49. Mr. Isaiah Leggett, County Executive, Montgomery Count, Maryland

50. Ms. Victoria Alvarado, Director, Office of International Religious Freedom, U.S. Department of State

51. Dr. Imad Dean Ahmad, Director, Minaret of Freedom Institute

52. Dr. Zainab Alwani, Assistant Professor of Islamic Studies, Howard University School of Divinity

53. Ms. Deborah L. Benedict, Associate Counsel, U.S. Citizenship and Immigration Services, Department of Homeland Security

54. Ms. Lora Berg, Senior Adviser to Special Representative to Muslim

Communities, U.S. Department of State

55. Dr. Charles Butterworth, Professor (Emeritus) of Government and Politics, University of Maryland, College Park

56. Father John Crossin, Executive Director for Secretariat for Ecumenical and Interreligious Affairs, United States Conference of Catholic Bishops

57. Major (Ret.) Franz Gayl, Senior Science Adviser, U.S. Marine Corps.

58. Dr. Sue Gurawadena-Vaughn, Director of International Religious Freedom and South East Asia Programs, Freedom House

59. Mr. Frank Jannuzi, Head of Washington Office, Amnesty International USA

60. Mr. T. Kumar, International Advocacy Director, Amnesty International USA

61. George Leventhal, Member of the Montgomery County Council

62. Mr. Amer Latif, Visiting Fellow, Wadhwani Chair in U.S.-India Policy Studies, Center for Strategic and International Studies

63. Mr. Tim Lenderking, Director of Pakistan Desk Office, U.S. State Department

64. Mr. Jalal Malik, International Affairs Officer, U.S. Army National Guard

65. Mr. Naveed Malik, Foreign Service Officer, U.S. Department of State

66. Ms. Dalia Mogahed, Senior Analyst and Executive Director, Gallup Center for Muslim Studies

67. Mr. Paul Monteiro, Associate Director, White House Office of Public Engagement

68. Major General David Quantock, United States Army Provost General

69. Ms. Tina Ramirez, Director of International and Government Relations, The Becket Fund

70. Rabbi David Saperstein, Director and Counsel, Religious Action Center for Reform Judaism

71. Chaplain, Brigadier General Alphonse Stephenson, Director of the National Guard Bureau Office of the Chaplain

72. Mr. Knox Thames, Director of Policy and Research, U.S. Commission on International Religious Freedom

73. Mr. Eric Treene, Special Counsel for Religious Discrimination, Civil Rights Division, U.S. Department of Justice

74. Dr. Hassan Abbas, Professor, Regional and Analytical Studies Department, National Defense University

75. Mr. Malik Siraj Akbar, Reagan-Fascell Fellow, National Endowment of Democracy

76. Mr. Matthew K. Asada, Congressional Fellow to Rep. Gary Peters

77. Ms. Stacy Burdett, Director of Government and National Affairs, Anti-Defamation League

78. Ms. Elizabeth Cassidy, Deputy Director for Policy and Research, U.S. Commission on International Religious Freedom

79. Ms. Aimee Chiu, Director of Media, Communication, and Public Relations, American Islamic Congress

80. Mr. Cornelius Cremin, Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Acting Deputy Director and Foreign Affairs Officer for Pakistan

81. Mr. Sadanand Dhume, Resident Fellow, American Enterprise Institute

82. Dr. Richard Gathro, Dean of Nyack College, Washington D.C.

83. Mr. Joe Grieboski, Chairman, The Institute on Religion and Public Policy

84. Ms. Sarah Grieboski, The Institute on Religion and Public Policy

85. Dr. Max Gross, Adjunct Professor, Prince Alwaleed Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University

86. Dr. Riaz Haider, Clinical Professor of Medicine, George Washington University

87. Ms. Huma Haque, Assistant Director, South Asia Center, Atlantic Council

88. Mr. Jay Kansara, Associate Director, Hindu American Foundation

89. Mr. Hamid Khan, Senior Program Officer, Rule of Law Center, U.S. Institute for Peace

90. Ms. Valerie Kirkpatrick, Associate for Refugees and U.S. Advocacy, Human Rights Watch

91. Mr. Alex Kronemer, Unity Productions

92. Mr. Paul Liben, Executive Writer, U.S. Commission on International Religious Freedom

93. Ms. Amy Lillis, Foreign Affairs Officer, U.S. Department of State

94. Mr. Graham Mason, Legislative Assistant to Rep. Allyson Schwartz

95. Ms. Lauren Markoe, Religion News Service

96. Mr. Dan Merica, CNN.com

97. Mr. Joseph V. Montville, Senior Associate, Merrimack College Center for the Study of Jewish-Christian-Muslim Relations

98. Mr. Aaron Myers, Program Officer, Freedom House

99. Ms. Attia Nasar, Regional Coordinating Officer, U.S. Department of State

100. Ms. Melanie Nezer, Senior Director, US Policy and Advocacy, HIAS

101. Dr. Elliott Parris, Bowie State University

102. Mr. John Pinna, Director of Government and International Relations, American Islamic Congress

103. Mr. Arif Rafiq, Adjunct Scholar, Middle East Institute

104. Ms. Maya Rajaratnam, Amnesty International

105. Ms. Rachel Sauer, Foreign Affairs Officer, U.S. Department of State

106. Dr. Jerome Schiele, Dean of College of Professional Studies, Bowie State University

107. Ms. Samantha Schnitzer, Staff, United States Commission on International Religious Freedom

108. Dr. Mary Hope Schwoebel, Senior Program Officer, Academy for International Conflict Management and Peacebuilding, U.S. Institute for Peace

109. Ms. Sarah Schlesinger, International and Government Relations Associate, The Becket Fund

110. Dr. Frank Sellin, Kyrgystan Desk Officer, U.S. Department of State

111. Ms. Anna-Lee Stangl, Christian Solidarity Worldwide

112. Ms. Kalinda Stephenson, Professional Staff, Tom Lantos Human Rights Commission

113. Mr. Jordan Tama, Lead Democratic Staffer, Tom Lantos Human Rights Commission

114. Mr. Shaun Tandon, AFP

115. Dr. Wilhelmus Valkenberg, Professor of Religion and Culture, The Catholic University of America

116. Mr. Anthony Vance, Director of External Affairs, Baha'is of the United States

117. Mr. Jihad Saleh Williams, Government Affairs Representative, Islamic Relief USA

118. Ms. Amelia Wang, Chief of Staff to Congresswoman Judy Chu

119. Ms. Moh Sharma, Legislative Fellow to Congresswoman Judy Chu

ঈদুল আযহার খুতবা

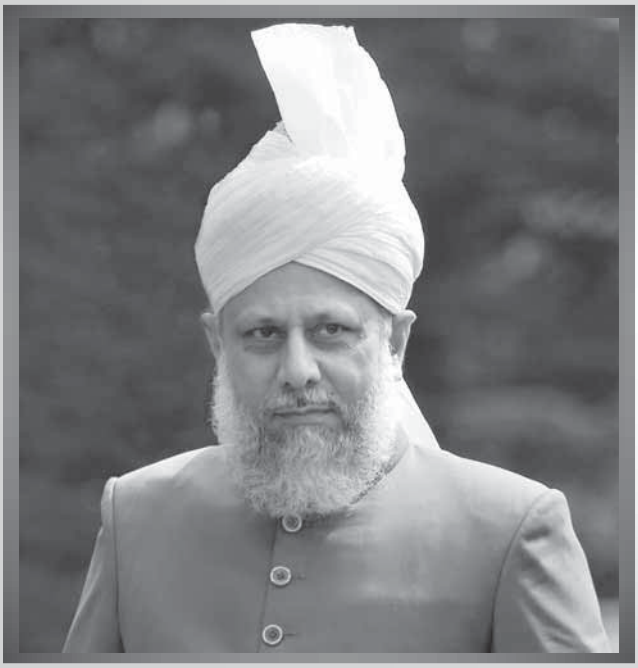

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক ৭ নভেম্বর ২০১১ মোতাবেক ৭ নবুওয়াত ১৩৯০ হিজরী শামসি লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ঈদুল আযহার খুতবা।

আজকে আমাদেরকে এই ঈদ উপলক্ষ্যে একত্রিত হয়ে এই চেষ্টা এবং দোয়া করা উচিত, আমরা এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও সেই মানদন্ড অর্জনকারী হবো, যার লক্ষ্যস্থল হবে কেবল খোদা তাআলার সত্বা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

আজ আমরা আমদের জীবনের আরো একটি ঈদুল আযহা উদযাপন করার জন্য এখানে একত্রিত হয়েছি। এই ঈদ, যাকে কুরবানীর ঈদও বলা হয়ে থাকে। এটি সেই কুরবানী বা ত্যাগ, যা মানুষকে কুরবানীর নতুন-পদ্ধতি শিখিয়েছে। এটি সেই কুরবানী যা খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়েছিল। এটি সেই কুরবানী, যা তওহীদকে (খোদার একত্ববাদকে) প্রতিষ্ঠিত করার জন্য করা হয়েছিল।

অতএব, এই ঈদ-এর জন্য আমাদের এখানে একত্রিত হওয়া, এই জন্য নয় যে, আমরা একটি সাধারণ আনন্দের দিন উদযাপন করব। নিশ্চয় এই খুশি বা আনন্দ, আল্লাহ্ এবং রাসূলের আদেশ-অনুযায়ী আমরা উদযাপন করে থাকি। আর ঈদের আনন্দ উদযাপন করার মাঝেও আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য বিদ্যমান। কিন্তু এর পিছনে যে মহান উদ্দেশ্য রয়েছে, তা সর্বদা আমাদেরকে নিজেদের সামনে রাখতে হবে এবং নিজেদের পরবর্তী-প্রজন্মের মাঝেও এই আদেশ ও প্রেরণা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য চেষ্টা এবং দোয়ার সাথে অগ্রসর হতে হবে। যেভাবে আমি বলেছি, এই কুরবানী আমাদেরকে কুরবানীর নতুন পদ্ধতি শিখিয়েছে, নতুন রাস্তা উন্মোচন করেছে, যার মাধ্যমে আন্তরিকতার সাথে আনুগত্যের উন্নত-মানের বহির্প্রকাশ ঘটে, যা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাইল (আ.) উপস্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং তৌহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ধারাবাহিকভাবে কুরবানীর এক দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার মাঝে কোন এক-ব্যক্তির কুরবানীই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সমস্ত পরিবার এবং বংশ-পরম্পরা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অতএব, আজকে আমাদেরকে এই ঈদ উপলক্ষ্যে একত্রিত হয়ে এই চেষ্টা এবং দোয়া করা উচিত, আমরা এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও সেই মানদন্ড অর্জনকারী হবো, যার লক্ষ্যস্থল হবে কেবল খোদা তাআলার সত্বা। এই যুগে আমরা আল্লাহ্ তা'লার মনোনিত এবং হযরত রসূলে করীম (সা.) এর নিষ্ঠাবান সেই প্রেমিককে মেনেছি, যাকে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যাদিষ্ট করে কয়েকবার রূপকভাবে ইব্রাহীম নামে সম্বোধন করেছেন।

অতএব, এই-যুগের ইব্রাহীমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার যে দায়িত্ব রয়েছে, তা পালন করার জন্য আমাদেরকে সেই মৌলিক-উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিতে রাখতে হবে, যাকে অর্জন করার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং তাঁর বংশধরগণ চেষ্টা করেছিলেন, আর সেটি ছিল–তাঁর (আল্লাহ্‌র) পরিপূর্ণ আনুগত্যে, আন্তরিকতা অবলম্বন করে তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা প্রত্যেক ধরনের কুরবানী করেছিলেন।

পবিত্র কুরআন করীম আমাদেরকে এটাই শিক্ষা দেয়, হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত ইসমাইল (আ.) এর কাছে তাঁর জীবনের কুরবানী চেয়েছিলেন।

খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পুত্র আনন্দের সাথে এই কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এই পরিস্থিতিতে হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে এই কুরবানী করা থেকে বাধা দেন, কেননা বাহ্যিকভাবে সন্তানের গলায় ছুড়ি চালানো বা কোন প্রাণের কুরবানীর মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য অর্জন হবে না। বরং সেই মহান উদ্দেশ্য তখনই অর্জন হবে যখন অনবরত কুরবানীর জন্য নিজের সন্তানদেরকে প্রস্তুত করবে আর সেই ধারাবাহিক-কুরবানী ততক্ষণ পর্যন্ত করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাআলার আদেশাবলীর উপর আমল করার জন্য পরিপূর্ণ-আনুগত্যের জোয়াল নিজের কাঁধে রাখবে আর যখন পরিপূর্ণ-আনুগত্য এবং অনুসরণের বহির্প্রকাশ হবে, তখনই এটা তওহীদ প্রতিষ্ঠিত করার আন্তরিক চেষ্টা হবে।

আর এটাই সেই ***'যিবহে আযীম'***, অর্থাৎ-মহান কুরবানী, যে কুরবানীর উন্নত-দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) নিজেদের নেক সন্তানদের এবং ভবিষ্যত-প্রজন্মের মাঝে প্রবহমান রাখার উপদেশ দিয়েছিলেন। ***'যিবহে আযীম'***, অর্থাৎ মহান কুরবানীতো এক-ব্যক্তির জীবন উৎসর্গের মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে না। এই 'জবাই'-র মাধ্যমে মানব জাতির কি উপকার হতো? হ্যাঁ! মানবজাতি তখনই লাভবান হতে পারত, যখন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং তওহীদকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে কুরবানী দেওয়া হত, পৃথিবীতে তওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করা হত, মানবতাকে খোদা তাআলার একত্ববাদের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা হত এবং ইবাদতের পদ্ধতি শিখানো হত।

তাই, আল্লাহ্ তা'লা যেখানে মহান কুরবানীর শিক্ষা ব্যক্ত করেছেন এরপর বলেছেন, ***'ওয়া তারাকনা আলাইহে ফিল আখেরিন'*** (সূরা আস্‌সাফফাত : ১০৯) অর্থাৎ আমরা পরবর্তীদের মাঝে তার সুখ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখলাম।

এরা ছিলেন সেই পিতৃপুরুষ, যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি-অর্জনকে নিজেদের জীবনের মূল-লক্ষ্য বানিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসার উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য কোন-ধরনের কুরবানী থেকে তারা পিছ পা হন নি। তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক বেশি চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে গেছেন। মৃত্যুতো একদিন না একদিন অবশ্যই আসবে। সফল মৃত্যু হচ্ছে সেটি যেটি, খোদা তাআলার সন্তুষ্টি-অর্জন করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। সেই মৃত্যুই সফল, যা তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য হয়ে থাকে। এই যে, যিক্‌রে খায়ের বা স্মৃতিচারণ, যা পরবর্তীতে আগমনকারীদের মাঝে খোদা তা'লা প্রবহমান রেখেছেন, এই কুরবানীকারীদের চূড়ান্ত মার্গ ও উন্নতি মহানবী (সা.) এর সত্তায় এবং তাঁর অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যুগে লাভ হয়েছে।

অতএব, হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাইল (আ.) এর কুরবানীর প্রকৃত-ফল প্রকাশ পেয়েছে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর মাধ্যমে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) দোয়া করেছিলেন

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ
إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٣٠﴾

(সূরা বাকারা : ১৩০)

অর্থাৎ 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক, আমাদের এ-ও নিবেদন, তুমি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে এক মহান-রসূলকে আবির্ভূত কর, যে তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিখাবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। নিশ্চয় তুমিই মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়'।

আল্লাহ্ তা'লা এই দোয়া গ্রহণ করে হযরত নবী করীম (সা.) এর পবিত্র সত্ত্বায় সেই নবীকে প্রেরণ করেছেন, যার মাঝে ***'যীবহে আযীম'***, অর্থাৎ মহান কুরবানীর এক দৃষ্টান্ত নব মহিমায় দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বরং তাঁর বয়আতের অন্তর্ভুক্তরাও কুরবানীর নব অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। পরিপূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা এবং তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা নতুন মানদন্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হযরত ইসমাইল (আ.) তো নবীর সন্তান ছিলেন, আর শৈশব থেকেই এমন পিতা-মাতার তরবীয়তের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যার মাঝে আল্লাহ্ তা'লার উপর পরিপূর্ণ ভরসা, বিশ্বাস ও ঈমান ছিল এবং তওহীদের উপর তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ঘরের মাঝেই তাঁর উত্তম-তরবিয়ত হয়েছিল। আর সবচেয়ে বড়-কথা হলো, নবুওয়াতের মর্যাদাও আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ওপর অর্পন করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তাঁকে তরবিয়ত প্রদান করেছেন, আর এ-কারণেই তিনি কুরবানীর জন্য নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু রসূল করীম (সা.) এর সাহাবারা ছিলেন তারা, যারা আধ্যাত্মিক-দৃষ্টিকোন থেকে ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে মৃত ছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁদেরকে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তির মাধ্যমে এমনভাবে জীবিত করেছেন যে, তারা তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবন, অর্থ-সম্পদ, সময় এবং সম্ভ্রমকে কুরবানী করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, প্রথমে হযরত নবী করীম (সা.) সেই অজ্ঞদেরকে মানুষ বানিয়েছেন, তারপর সুশিক্ষিত-মানুষ বানিয়েছেন, তারপর খোদা-প্রেমিক মানুষে পরিণত করেছেন। অত:পর এই আল্লাহ্ ওয়ালা মানুষ আনুগত্য, বিশ্বস্ততা এবং কুরবানী ও ইবাদতের সেই উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, সমগ্র বিশ্বকে বিস্ময়াভিভূত করে দিয়েছেন।

তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা জীবন কুরবানী করেছেন, অত:পর এই কুরবানীসমূহ প্রদানকালে মৃত্যুর সামনে চোখে চোখ রেখে নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং আগত-প্রজন্মের জন্য সেই-দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, যা দীর্ঘকাল উম্মতে মুসলেমার জন্য অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাজ করেছে, আর নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে প্রেরণা যুগিয়েছে, কিন্তু কয়েক শতাব্দী পর জাগতিক ভাবে বিজয় লাভের পর সেই উদ্দেশ্যকে তারা ভুলে বসে, যা এক প্রকৃত-মুসলমানের মাঝে থাকা উচিত ছিল।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর এই দোয়াকে তারা ভুলে গেছে যা 'যীবহে আযীম', অর্থাৎ-মহান কুরবানীর দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করতে ভবিষ্যত আগমনকারীদের জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ.) করেছিলেন, তারা হযরত নবী করীম (সা.) এর আগমনমনের উদ্দেশ্যকেও ভুলে গেছে। যখন আল্লাহ্ তা'লার আদেশের আওতায় নিজের গর্দান সেইভাবে অগ্রে প্রেরণ করা থেকে দূরে সরে গেছে তারা, যেভাবে কুরবানীর-পশু কসাই-এর সামনে নিজের ঘাড় নত করে রাখে। ইসলামের সেই অর্থকে তারা ভুলে গেছে, অর্থাৎ-ইসলামতো নিজের সমস্ত কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে সর্বদিক থেকে গ্রহণ করার শিক্ষা দেয়। তারা সেই অর্থকে ভুলে গেছে যে, খোদা তালার সত্তায় বিলীন হয়ে নিজের জীবনে এক মৃত্যুকে বরণ

করতে হবে। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির স্থলে ব্যক্তিগত-আকাঙ্খা প্রাধান্য লাভ করলো, তখন সেই ফলাফল প্রকাশ পাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল, যে সমস্ত ফলাফলের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছিলেন। ফলে পৃথিবীর এক বিশাল অংশের কর্তৃত্ব করত যারা, স্বদেশেই তারা পরাধীন হয়ে গেছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে লিখেন, চিন্তা করে দেখুন, শুধুমাত্র হাসি-তামাশা, আনন্দ, ফুর্তি ছাড়া আজকে আধ্যাত্মিকতার কিছু কি অবশিষ্ট রয়েছে। এই ঈদুল আযহা প্রথম-ঈদের তুলনায় বড় আর সাধারণ লোকেরা একে বড় ঈদও বলে থাকে। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন যে, ঈদের কারণে কতজন আছে যারা আত্মশুদ্ধি এবং হৃদয় পবিত্রকরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আর আধ্যাত্মিকতাকে জীবনের অংশ বানিয়ে নেয়, আর ঈদুল আযহা-তে নিহিত জ্যোতিময় আলোকে পাওয়ার চেষ্টা করে থাকে, রমযানের ঈদ আসলে এক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও ব্যক্তিগত সংগ্রামের নাম, আর এর নাম হল 'বজলুর রুহ', অর্থাৎ-আত্মাকে কষ্টের ভিতর নিপতিত করা। তবে এই যে ঈদ, অর্থাৎ-ঈদুল আযহা, যাকে বড়-ঈদ বলা হয়, যার মধ্যে এক মহান উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। কিন্তু আফসোস! এই দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়নি। খোদা তা'লার দয়ার বহির্প্রকাশ অনেকভাবে হয়ে থাকে। তিনি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার উপর অনেক বড় একটি অনুগ্রহ করেছেন যে, অন্যান্য উম্মতের মাঝে যে কথাগুলো শুধু অন্তঃসারশূন্য খোসা হিসেবে ছিল এই উম্মত সেই মর্মকে ধারণ করেছে।

অতএব, প্রশ্ন তো কেবল এখানে এই নয় যে, শুধুমাত্র ঈদকে ভুলে গেছে, বরং প্রকৃতভাবে এর শিক্ষাকেও ভুলে গেছে। গত দিন সৌদি আরবের কাবা শরীফের ইমাম মক্কায় হজ্জের খুতবায় মুসলিম দেশগুলোর মনোযোগ এই দিকে আকর্ষণ করেছেন যে, তোমরা নিজেদের দায়িত্বকে অনুধাবন করার চেষ্টা কর, আর আমাদের দৃষ্টি ঐক্যের দিকে নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। দীর্ঘ খুতবা ছিল, তবে খুতবার সারবস্তু এটাই ছিল। কিন্তু তাদের নিজেদের মনগড়া-পদ্ধতি অনুযায়ী এই ঐক্য অর্জন করা কখনো সম্ভব নয়। প্রথম কথা হল, যেভাবে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সব কিছু আজ এরা ভুলে গেছে। তাদের না রয়েছে আত্মসম্মান আর না ধর্ম। তাদের ধর্ম চলে গেছে, আর দুনিয়াও হাত ছাড়া হয়ে গেছে। উম্মতে মুসলেমাকে একত্রিত করার জন্য খোদা তা'লার বর্ণিত পদ্ধতির উপরই চলতে হবে। কারো কোন ব্যক্তিগত-প্রস্তাব বা পদ্ধতি এবং কোন ইমামের পদ্ধতিও এতে কাজে আসতে পারে না। কেবল সেই ইমামের প্রস্তাবিত পদ্ধতিই কাজে আসবে, যাকে খোদা তা'লা স্বয়ং ইমাম মনোনিত করে প্রেরণ করেছেন। সেই ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে, যাকে খোদা তা'লা ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, সমগ্র পৃথিবীতে যত মুসলমান আছে তাদেরকে একত্রিত করে এক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কর।

অতএব, যুগ ইমামের সাথে যারা সম্পৃক্ত হবে, কেবল মাত্র তারাই সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে, আর সেই সমস্ত দোয়ার উত্তরাধিকারী হতে পারবে, যা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাইল (আ.) পবিত্র কাবা-গৃহ নির্মাণের সময় করেছিলেন। কেননা, কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা এই ঘোষণাই করেছেন, যেভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার আয়াত শুনাতেন, লোকদেরকে পবিত্র করতেন এবং কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিতেন, আর হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর দোয়া, যা খোদা তা'লারই একটি ঐশী তকদীর ছিল। তা-ই বড় মহিমার সাথে মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। একইভাবে, আখারীনদের, অর্থাৎ-পরবর্তীদের মাঝেও হযরত নবী করীম (সা.) এর এক নিবেদিত-প্রেমিকও মহানবী (সা.)-এর দোয়া গৃহীত হওয়ার নমুনা স্বরূপ সৃষ্টি হবে, যিনি পুণরায় সেই উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ করবেন, যেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পুরো-বংশ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, যেই উদ্দেশ্যে তিনি নিজের সন্তান-সন্ততিদেরকে কুরবানীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে থেকেছেন, যা খানা কাবা প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল, অর্থাৎ-তওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। আর যে-উদ্দেশ্যে হযরত নবী করীম (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করে কুরবানীর সেই মহান দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা শ্রবণ করে মানুষ আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায়, আর এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার পবিত্রতা এবং প্রশংসার গীত মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে গাইতে থাকে।

অতএব, আজকে প্রত্যেক আহমদীর কাজ হল, আমরা যদি এই কুরবানী-ঈদের প্রকৃত-মর্ম এবং তত্ত্বকে অনুধাবন করতে চাই, তাহলে খোদা তা'লাতে বিলীন হয়ে যাওয়ার পোশাক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাঝে বিলীন হয়ে আমাদেরকে পরিধান করতে হবে। কেননা, খোদা তা'লা একথাই আমাদেরকে বলেছেন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে চাও, আল্লাহ্‌র সাথে প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাও, তাহলে হযরত নবী করীম (সা.) যা করেন, তাই তোমরা কর। তাঁর (সা.) সুন্নতের উপর আমল কর, তাঁর আদেশাবলীর অনুসরণ কর, তাঁর আনীত শরীয়তের পরিপূর্ণ আনুগত্য কর। ***'কুল আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসুল'*** (সূরা নূর : ৫৬) অর্থাৎ 'আল্লাহ্ ও এই রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য কর'-এর মহান দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত কর।

খোদার ইবাদতের ক্ষেত্রে এমন উন্নত-নমুনা প্রতিষ্ঠা কর, যেন তোমাদের প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গির মাঝে একত্ববাদের বহির্প্রকাশ ঘটে। অবস্থা এমন হলে, খোদা তা'লা তাঁর এমন বান্দাকে অনেক নৈকট্য ও সম্মান দান করেন। হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, খোদা তা'লার এমন নৈকট্য ফরজের সাথে নফল আদায়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অর্থাৎ-মানুষ যখন ফরজ আদায়ের সাথে নফলও আদায় করে, তখনই খোদার-নৈকট্য লাভ হয়, আর আল্লাহ্ তা'লা এমন বান্দাদের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তার কান হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শ্রবণ করে, আমি তার চোখ হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে, আমি তার পা হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে হাটে।

অতএব, খোদা তা'লার সাথে ভালবাসার এই মান যদি অর্জন করতে হয়, তাহলে আমাদেরকে অব্যাহতভাবে নিজ আত্মার কুরবানীর প্রয়োজন রয়েছে। আর এই চেষ্টা-প্রচেষ্টাই আমাদের অন্তরে তওহীদের চেতনা সৃষ্টি করবে। আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কই আমাদেরকে শত্রুদের হাত থেকে মুক্তি দান করবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই মান অর্জন করার তৌফিক দান করুন, যেন আমরা অচিরেই আহমদীয়াতের পথে বিরোধীদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়, তা দূর হতে দেখি। প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই আছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রাও ক্রমশঃ অগ্রসরমান রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিরোধীরা যেসব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, আল্লাহ্ তা'লা সেসব প্রতিবন্ধকতাকেও দূর করে দিন। আর

এরফলে সাময়িক-অস্থিরতাও হয়। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য আমাদেরকে ইবাদতের উন্নত-মান প্রতিষ্ঠা করারও অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে।

নি:সন্দেহে আজকে আহমদীদের অধিকাংশ নিজের জান, মাল, সময় এবং সম্ভ্রমকে কুরবানী দিয়ে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে কিছু এমনও আছে, যার মান অনেক উন্নত। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, ইবাদতের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করার অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই তৌফিক দান করুন। আমাদেরকে নিজেদের ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের মাঝে এই প্রেরণা প্রবহমান রাখার তৌফিক দান করুন। কেননা, খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া আমরা কখনো বিজয় দেখতে পাব না। এই একই বিশ্বাস আমাদেরকে পরবর্তী-প্রজন্মের মাঝেও সৃষ্টি করতে হবে।

এতে কোন সন্দেহ নেই, ইসলাম অবশ্যই জয়যুক্ত হবে। আর এতেও সন্দেহ নেই, এই যুগে আহমদীয়াতের বিজয় নির্ধারিত। তবে এই বিজয়কে আমাদের নিজেদের জীবনে দেখার মাধ্যম একটাই আর তা হল, খোদা তা'লার আচলকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে যেন, ***"ইন্নি কারীব"*** এবং ***"আলা ইন্না নাসরুল্লাহে কারীব"***, অর্থাৎ-নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকটে রয়েছি এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সাহায্য সন্নিকট–আল্লাহ্ তা'লার এই আওয়াজ আমরা শুনতে পাই। আমাদেরকে সর্বদা এটি স্মরণ রাখতে হবে যে, আজকে কেবল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাত-ই আছে, যারা তওহীদের প্রকৃত-রক্ষাকারী, আর এ-উদ্দেশ্যেই আহমদীরা কুরবানী দিয়ে যাচ্ছে। অনেক বেশি ত্যাগ-স্বীকার করে যাচ্ছে, বরং ***"মান হাইসুল জামাত"***, সমস্ত জামাতই কুরবানী দিয়ে যাচ্ছে। আজকে কেউ ***"আলা ইন্না নাসরুল্লাহে কারীব"*** (সূরা বাকারা ২১৪)-এর আওয়াজ শোনার যোগ্যতা যদি রাখেন, তাহলে তা কেবল আহমদীরাই। আহমদীরা ছাড়া আর কেউ নেই।

অতএব, যেভাবে আমি বলেছি, আমাদেরকে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রগামী হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিজের সম্পর্ক দৃঢ় করার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা নিজেদের উপর আল্লাহ্ তা'লার স্নেহের দৃষ্টি পড়তে যেমন দেখব, তেমনি বিশ্বের মানুষকেও তওহীদের বাণী পৌঁছিয়ে এক হাতে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এরও সৌভাগ্য দান করুন।

এরপর আমরা দোয়া করব। দোয়ার মধ্যে শহীদদের পরিবারবর্গকে আপনারা স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজ বিশেষ-সুরক্ষার বেষ্টনিতে স্থান দিন। তাদের প্রিয়দের কুরবানীগুলো যেন দ্রুত ফল বয়ে নিয়ে আসে, আর আমরা যেন আহমদীয়াতের বিজয়কে কয়েকগুণ বর্ধিত আকারে ফলতে দেখি। ***আসীরানে রাহে মাওলা***, অর্থাৎ-আল্লাহ্‌র পথে যারা বন্দি রয়েছে, তাদেরকেও দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

এখন পাকিস্তানের বাহিরে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে খোদা তা'লার পথে আসিরানে রাহে মাওলা সৃষ্টি হচ্ছে যারা আল্লাহ্-র পথে কারা-বরনের কষ্ট ভোগ করছেন। এই বছরের শুরুর দিকে মিশরে আহমদীয়াতের কারণে স্থানীয় মিশরীয় আহমীদেরকে বন্দিদশার দিন অতিবাহিত করতে হয়েছে। কিন্তু যাই হোক, তারা মুক্তি লাভ করেছেন, সেখানকার আইনের পরিবর্তনের পূর্বেই খোদার ফজলে তারা মুক্তি লাভ করেছেন। আজকাল আমাদের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সারজার অধিবাসী এক আরব বন্ধু, তিনি আহমদীয়াতের কারণে বন্দীদশার দিন অতিবাহিত করছেন। আর এই ঈদও তিনি কারাবরণ অবস্থাতেই পালন করছেন। খোদা তা'লার কৃপায় তিনি একাই আহমদী এবং অত্যন্ত দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। মহান খোদা তা'লা দ্রুত তার মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন।

একইভাবে, ভারতে আমাদের এক মোয়াল্লেমকে গত বছর কাদিয়ানের জলসায় যখন তিনি নওমোবাইনদেরকে নিয়ে আসছিলেন, তখন তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত তার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। আল্লাহ্ তা'লা অতিসত্ত্বর তারও সন্ধানের ব্যবস্থা করুন। পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে অনেক আহমদী অপহৃত অবস্থায় রয়েছেন, যার মধ্যে দশ-বার বছরের এক বালকও অন্তর্ভুক্ত। তার পিতার সাথে তাকেও অপহরণকারীরা অপহরণ করে। খোদা তা'লা তাদের সন্ধান লাভের দ্রুত ব্যবস্থা করে দিন। জামা'তের জন্য যারা আর্থিক কুরবানী করেন, তাদের জন্যও অনেক বেশি দোয়া করুন। খোদা তা'লা তাদেরকে উত্তম-প্রতিদান দিন এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রভূত বরকত দান করুন।

যারা দূর্বল, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দান করুন, তাদের দুর্বলতা দূরীভূত হওয়ার জন্য দোয়া করুন। ওয়াকফে নওদের জন্য দোয়া করুন। অনেক এমন আছে, যারা অনেক প্রতিকুল অবস্থায় থেকেও অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে ওয়াকফের প্রেরণা অন্তরে রেখে কুরবানী দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে উত্তম-প্রতিদান দিন, আর নিজ-সুরক্ষার মাঝে স্থান দিন। তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে খোদা তা'লা অনেক বেশী ফলবান করুন। সমস্ত অসুস্থদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে আরোগ্য দান করুন। কিছু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষ রয়েছেন, তাদের অস্থিরতা যেন খোদা তা'লা দূর করে দেন, সেজন্য দোয়া করুন।

যারা বিভিন্ন ধরণের সমস্যা এবং কষ্টে দিনাতিপাত করছেন, তাদেরকেও দোয়ায় স্মরণ রাখুন, কোন না কোনভাবে যারাই সমস্যার সম্মুখীন রয়েছে, তাদেরকেও দোয়ায় স্মরণ রাখুন। সমস্ত পৃথিবীর জামাতগুলোকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সব-ধরনের পেরেশানী এবং দুশ্চিন্তা থেকে সুরক্ষা দান করুন।

সমস্ত উম্মতে মুসলেমার জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে যেন বিবেক-বুদ্ধি দান করেন, এবং এই যুগের ইমামকে চিনতে পারেন, আর তাদের হারানো গৌরবকে যেন পুণরায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সমগ্র মানবজাতিকে নিজের দোয়ায় স্মরণ রাখবেন, কেননা, খোদা তা'লাকে ভুলে তারা যে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে এ থেকে সুরক্ষা দান করেন, আর আমাদেরকেও এই তৌফিক দান করুন, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার তৌহিদের এই বাণীকে পৃথিবীতে উত্তমভাবে প্রচার করতে পারি।

খুতবায়ে সানিয়া এবং দোয়ার পর হুযূর (আই.) বলেন-***আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,*** সবাইকে ঈদ মোবারক। আর যারা এখানে বসে আছেন, আপনাদেরকেও, আর পৃথিবীর সর্বত্র যেখানেই আহমদী আছে, সবাইকে ***ঈদ মোবারক***। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদিক দিয়ে বরকতমন্ডিত করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্।

ভাষান্তর: **মাহমুদ আহমদ সুমন**
ওয়াকফে জিন্দেগী

বাঙ্গালী-আহমদীদের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) প্রদত্ত দিক-নির্দেশনামূলক চিরসবুজ এক নসিহত

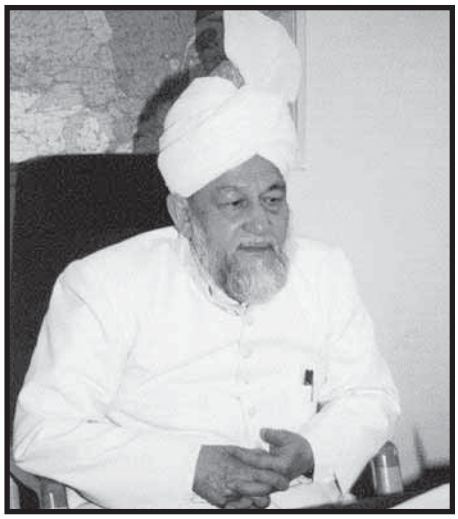

[আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর ৭৪তম সালানা জলসায় নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আই.) ১৪ ফেব্রুয়ারী '৯৮ বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫-৩০ মি: স্যাটেলাইট চ্যানেল মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া (mta) যোগে সরাসরি দিক-নির্দেশনামূলক নসিহতপূর্ণ এক পয়গাম প্রদান করেন। এ বাণীর মর্ম-কথা বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের জন্য বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ আশিসে অভিসিক্ত। এ থেকে বরকতমন্ডিত হতে আমরা পুণরায় তা পত্রস্থ করছি]

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আমি প্রথমে বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমার নিজের কিছু কথা বলতে চাচ্ছি। এমন সময়ের কথা বলছি, যখন বাংলদেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়নি। বাংলাদেশ তো অবশ্যই ছিল। ঐ যুগ থেকেই বাংলাদেশের প্রতি আমার গভীর ভালবাসা আছে। আমি বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে গিয়েছি। আমি বাংলাদেশের সব এলাকা দেখেছি। উত্তর থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব থেকে পশ্চিম, সর্বত্র গিয়েছি। সুন্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বহু অংশ, যেমন– রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল, যা বার্মার সাথে মিশেছে, সেই উপকূল অঞ্চল খুবই মনোরম। এই সকল অঞ্চল ঘুরে ঘুরে দেখেছি। এমন কোন অঞ্চল নেই, যা আজও আমার মনে পড়ে না। আল্লাহ্ আপনাদিগকে খুবই সুন্দর দেশ দিয়েছেন। এমন দেশ, যা খুবই প্রিয়, খুবই সুন্দর, দেশের মানুষগুলোও খুবই সুন্দর। আমি স্থান দেখতে যেতাম না; যদিও স্থান দেখারও আমার শখ আছে, আমি মানুষের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। বাংলাদেশের মানুষ আমাকে মনে রেখেছেন। আমার এখনও স্মরণ আছে, কে কেমন লম্বা, তাদের বাচনভঙ্গী কেমন, ইত্যাদি। এছাড়াও, তাদের সকল কথাই আমার জানা আছে। আমার স্মৃতিপটে, এখনও (এইসব স্মৃতি) অঙ্কিত আছে। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, যেখানে খুব দ্রুত আহমদীয়াতের বিস্তৃতি হতে পারে। এমনই যেন হয়, এটাই আমার ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টা।

কিন্তু এখন পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদী আলেমদের হুমকি সাধারণ ও নিরীহ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। তারা তাদের হুমকিতে ভীত হয়ে পড়েন। সুতরাং, এই কারণে প্রচার ও বিস্তারের কিছুটা বাধার সৃষ্টি হয়। আমার অনুরোধ এই যে, আপনারা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। মানুষের ভয়ে ভীত হবেন না। কাউকে গ্রাহ্য করবেন না। আল্লাহ্‌র ভয় এবং হিকমত ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে এমন কথা বলুন, যা মানুষের হৃদয়ে স্থান লাভ করে, রেখাপাত করে। ভাল কথা বলুন। শত্রুকে ভয় করবেন না। মনে রাখবেন, শত্রুর প্রোপাগান্ডা ও অপপ্রচারের ফলে মানুষ প্রভাবান্বিত হয়ে যায়।

অতএব, আপনাদের জন্যে জরুরী বিষয় এই যে, আপনারা আপামর জনতার কাছেই (দাওয়াত) পৌঁছাবেন। আমার ধারণা এই যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বাংলাদেশের অধিকাংশ আলেমের মন স্বচ্ছ আছে। তাঁরা সত্যিই ধর্মকে ভালবাসেন। তারা পাঞ্জাবী আলেমদের মত কট্টর ও দুষ্ট নন। এর প্রমাণ হলো এই যে, পাঞ্জাবেই হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভাব হয়েছেন। যদি হিন্দুস্থানের পাঞ্জাবের আলেমরা আসলেই কট্টর না হতেন, তাহলে সেখানে ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আসতেন না। সবচে' খারাপ লোক যেখানে থাকে, আল্লাহ্ তাআলা সে স্থানকেই তাদের সংশোধনের জন্যে সতর্ককারী পাঠাবার স্থান হিসাবে চিহ্নিত করেন। পাঞ্জাব থেকে 'মুর্খ' আলেমরা এত বেশী সৃষ্ট হন যে, সাধরণ মানুষ ভুলক্রমে মনে করেন যে, এসকল আলেম গোটা হিন্দুস্থান থেকেই তৈরী হচ্ছেন। সমগ্র হিন্দুস্থানে বেশ ভারী সংখ্যায় মৌলভী সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে বেশীর ভাগই পাঞ্জাবী। হাজারা থেকে হোক বা লুধিয়ানা থেকে, এরা আসলে সকলেই পাঞ্জাবের অধিবাসী। এবং এরা রুটি-রুজির ব্যবস্থা করার জন্যই ধর্ম শিখে থাকে। কুরআনে বলা হয়েছে–তোমরা কি আল্লাহ্‌র বান্দার বিরোধিতা করে নিজেদের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করবে? এরা দিনের শিক্ষা কেবল রুটি রুজির কারণেই করে থাকে। এরা সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে আছে। খোঁজ করলে দেখতে পারবেন যে, এই সকল মৌলভীদের সিংহভাগই পাঞ্জাবী। সবচে' কট্টর ও দুষ্ট মৌলভী পাঞ্জাব থেকেই সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্ তাআলা এই পাঞ্জাবেই হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। আমি যেসব কথা বলছি, তা কুরআন এবং হাদীসের উপর ভিত্তি করেই বলছি। বাংলাদেশের আলেমগণ দুষ্টুমিতে কখনো পাঞ্জাবী আলেমদের সাথে পারবেন না। কোনক্রমে পাঞ্জাবীদের সাথে

দুষ্টুমিতে পাল্লা দেয়ার প্রশ্নও উঠে না। প্রয়োজনে যতটা ইচ্ছা প্রতিযোগিতা করে দেখতে পারেন। আমি যখন বাংলাদেশে যেতাম এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতাম, তখন আমার সাথে (প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর) মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব ও অন্য যারা থাকতেন, তাদেরকে বলতাম যে, আপনারা দেখে শুনে সবচেয়ে কট্টর আলেমকে আমার সাথে দেখা করার জন্য, কথা বলার জন্য নিয়ে আসুন। তারা এই ভেবে ভয় পেতো যে, মৌলভী না আবার আমার সঙ্গে বেয়াদবী করে বসে।

আমি বলতাম, ভয় করো না, বরং সবচে' দুষ্টজনকে ডেকে আন। ডাকার পর যখন আমি তার সাথে কথা বলতাম, তখন সেই দুষ্ট-মৌলভী আমার বন্ধু হয়ে ফেরত যেতেন। যদি বুদ্ধিমত্তার সাথে যুক্তিসঙ্গত কথা বলা হয়, তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উগ্র-প্রকৃতির মৌলভীও নমনীয়-কমনীয় হয়ে যায়। হ্যাঁ, যাদের ভাগ্যে সংশোধন নেই, এমন লোক সর্বত্রই কিছু না কিছু পাওয়া যাবে। যারা কথার মাঝে শোরগোল করে উঠে যায়, তাদেরকে পরিহার করুন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, অধিকাংশ আলেমের নিকট যাওয়া আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাদের সাথে যুক্তি-প্রমাণ ও ভালবাসার সাথে কথা বলুন। বুঝাতে চেষ্টা করুন যে, আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে। দেখবেন, কত বিপুল সংখ্যক আলেম আমাদের সমর্থনে এসে যান। এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

জনসাধারণের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয়, তাদের নিকট গিয়েও বলুন, যা উলামাকে বলেছেন। ফলশ্রুতিতে এমন অনেক শ্রেণী আপনাদের সমর্থনে এসে যাবে। আর তখন আহমদীরা নির্ভয়ে আহমদীয়াতের কথা প্রচার করার সুযোগ পাবেন।

অতএব আহমদীয়া মুসিলম জামাত, বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব, তারা যেন আহমদী ভাইদের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করেন। যেভাবে যুদ্ধের সময় উপর থেকে ভারী বোমা ফেলে যুদ্ধাঞ্চলকে শত্রুমুক্ত করে দেয়া হয় আর তখন সাধারণ পদাতিক সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, এখন এগোও। যে এলাকায় গোলাগুলি চলতে থাকে ঐ এলাকায় সাধারণ লোক গেলে তারা গুলির সম্মুখীন হয়ে মারা পড়ে।

অতএব, যুদ্ধে জয়ী হতে হলে প্রথমে ঐ এলাকার পরিস্থিতি ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়, তারপর সাধারণ সৈনিকদেরকে নির্দেশ দিতে হয়, "যাও, এবার অঞ্চল দখল করে নাও। আমাদের অঞ্চল তো মানুষের হৃদয়ে। আমাদের অঞ্চল কোন ভৌগলিক-সীমারেখায় আবদ্ধ নয়। অতএব, হৃদয় জয় ও দখল করার পূর্বে আধ্যাত্মিক বোমা বর্ষণ আত্যাবশ্যক। প্রথমে আলেমগণের হৃদয় জয় করুন, জন প্রতিনিধিদের মন জয় করুন, তারপর জনসাধারণের মন জয় করুন।

এটি আমার বাণী ও কথা, যা কি-না আমি বিভিন্ন মাধ্যমে আপনাদেরকে প্রথম থেকেই বলে আসছি। আপনারা সবাই ঠিকমত জানতে পেরেছেন কি-না, তা আল্লাহ্ জানেন। কিন্তু আজ আপনারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। এইরূপ কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের প্রচারকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিন। এমন হলে বাংলাদেশ এমন একটি বিরাট কল্যাণী-রাষ্ট্রে পরিনত হতে পারে, যেখানে খাঁটি ইসলামী-আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে।

মৌলভীরা ইসলামের নামে সরলমানা মানুষকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। তারা মানুষকে ইসলামের কোন দিক-নির্দেশনা দেয় না। তারা মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা রাখে না। মানুষ অনাহারে মরলেও এদের কোন চিন্তা নেই, নেই কোন মাথা-ব্যথা। ইসলামী-রাষ্ট্র তো এমন হবে, যেখানে মানুষের দারিদ্রকে দূর করা হবে। কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক খোরাকেরই চিন্তা করা হবে না বরং দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাতিক খোরাকেরও ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশের প্রতি আমার ভালবাসা ও সমবেদনা আমাকে বলতে বাধ্য করেছে, তাই আমি আপনাদেরকে বলছি যে, আজ আপনাদের সকল প্রকার অভাব দূরীকরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে আহমদীয়াত। দেশের দারিদ্রতা, নৈতিক অধঃপতন, সামাজিক অশান্তি, যুলুম-অত্যাচার, এই সব কিছুর হাত থেকে একমাত্র আহমদীয়াতই আপনাদেরকে নিস্কৃতি দিতে পারে, উদ্ধার করতে পারে।

আপনারাতো মৌলবাদকে প্রথম থেকেই লালন করে রেখেছেন। প্রথম থেকেই মৌলভীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। আহমদী হন বা গয়ের আহমদী, সকলেই মৌলভীদের পিছনে চলছেন। মৌলভীরা কোথায় কি এমন পরিবর্তন সাধন করেছেন? কোথায় তারা ইসলামী-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেছেন? কোথায় পুণ্য-পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করেছেন? সারা বাংলাদেশতো আগের মতই দিশেহারা, অথচ মৌলভীদের রাজত্ব সেখানে। এই রাজা থেকে আপনারা কী পেতে পারেন, যে রাজা বিগত পঞ্চাশ বছরে আপনাদেরকে কিছুই দিতে পারেনি? আগামীতেই বা তারা কী দেবে? কিন্তু যে-গ্রাম আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে সেই গ্রামকে দেখুন কত ভাল পরিবেশ সেখানে! তারা পরস্পর কত সুন্দর হৃদ্যতার পরিবেশে বাস করছেন।

আপনাদের জন্য আমার এই বাণী-এই পয়গাম। আমাকে এখন অন্য প্রোগ্রামে যেতে হচ্ছে, আমি আশা করি আপনারা আমার এই বার্তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিবেন। খুব ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করে নিন, যা আমি বলেছি। যে ব্যবস্থা-পত্র আমি দিয়েছি, ইহাই সঠিক ব্যবস্থা-পত্র। এছাড়া অন্যকোন ব্যবস্থা-পত্র আপনারা কোথাও খুঁজে পাবেন না।

আমি বাংলাদেশের মন জয় করতে চাই। যতশীঘ্র সম্ভব এই মহা-বিপ্লব সাধন করতে হবে। তাইতো পাকিস্তানে মৌলভীরা বারবার বাংলাদেশের উপর আক্রমণ করে, যেন এদেশও পাকিস্তানের মত হয়। আপনারা পাকিস্তানীদের মতই যদি হতে চান, তাহলে কেন আপনারা এথেকে পৃথক হয়েছিলেন? পাকিস্তানকে পরিত্যাগ করুন। এমনিতেই আপনারা অনেক কষ্টে আছেন। সুতরাং, পাকিস্তান যে নোংরা-আবর্জনায় ছেয়ে আছে, তা আপনারা কিছুতেই গ্রহণ করবেন না।

আহমদীয়াত এখনও আপনাদের ওখানে তেমন বিস্তার লাভ করেনি। আর যেখানে বিস্তার লাভ করেছে, সেখানে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। একটি পৃথক (নযরকরা) মনোরম-দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। এই দ্বীপ প্রেম ও ভালবাসায় সিক্ত ও সিঞ্চিত। আপনারা সমগ্র দেশকে এরূপ একটি আহমদী-দ্বীপে পরিণত করুন। আপনারা এখানে বড় বড় বুদ্ধিজীবীরা বসে আছেন, পত্রিকার প্রতিনিধিরাও। বড় বড় মিডিয়ার প্রতিনিধিরাও আছেন। বড় সম্মানীত জ্ঞানীরা বসে আছেন। আমি জানি, তাদের হৃদয় সাক্ষ্য দেবে যে, আমি সত্য বলছি। অতএব, আমার আবেদন এই যে, আমার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আপনারা আমার কথার সমর্থন করুন। আমার এই বাণীটিকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিন। আল্লাহ্ আপনাদের সাথী হউন। (এরপর হুযূর (আই.) বাংলায় বলেন–অনুবাদক) আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আমি এখন বিদায় নিচ্ছি।

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

অনুবাদ–**মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী ও মৌলভী আহমদ তারেক মুবাশ্বের**। (অডিও ক্যাসেট থেকে শ্রুত ও অনুদিত)

রসূল অবমাননার শাস্তি

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ

বর্তমান সময়ে রসূল অবমাননার বিষয়টি সবার মুখে মুখে। এর কারণ হলো, এক অপবিত্র, অভিশপ্ত-আত্মা সর্বশ্রেষ্ঠ-মানব, নবীকূল শিরোমণি, খাতামুল আম্বিয়া মহানবী (সা.)-এর সন্মানহানির দু:সাহস করেছে। সে যা করেছে, তাতে সে চাঁদের গায়ে থুথু ফেলেছে, অর্থাৎ-আকাশে থুথু দিয়ে নিজের গায়ে ফেলেছে। মুসলিম-বিশ্বের হৃদয় আজ ক্ষত-বিক্ষত। এ-ঘটনায় প্রত্যেক রসূল-প্রেমিকের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। মহানবী (সা.) এর প্রেমিকদের অনেকে অগ্নিশর্মা হয়ে বিভিন্ন-ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এবং বিভিন্ন-ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে।

আমাদের জানা উচিৎ মহানবী (সা.) এক অক্ষয় সম্মানের অধিকারী ও প্রশংসার সর্বোচ্চ-আসনে সমাসীন। এ সৃষ্টিকূলে কেউ-ই তাঁর সন্মান ও মর্যাদার ধারে-কাছে পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখে না এবং পৌঁছানোর কল্পনাও করতে পারে না। তাই, যারা মহানবী (সা.) এর মর্যাদাহানীর হীন-চেষ্টা করে, তারা নিজেদেরকে অভিশপ্ত ও লাঞ্ছিত সাব্যস্ত করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। রসূল-অবমাননার বিষয়টি অতিব গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান-যুগে অনেক আলেম এর শাস্তি মৃত্যুদন্ড বলে ফতওয়া দিয়েছে। বিশেষ করে পাকিস্তানে এ-বিষয়ে আইন-প্রনয়ন করে তা কার্যকর করা হয়েছে। মুসলিম জগতে এ বিষয়টিকে এখন BLASPHEMY শব্দে ব্যবহার করা হচ্ছে।

BLASPHEMY, দুটি গ্রীক-শব্দের সমষ্টি। একাংশের বাংলা-অনুবাদ হলো ক্ষতিগ্রস্থ করা বা আহত করা আর অপরাংশের অনুবাদ হলো সুখ্যাতি বা মর্যাদা। ইহুদি-ধর্মে এ-শব্দটি ইশ্বরনিন্দার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে, আর এর শাস্তি হলো প্রস্তরাঘাতে মৃত্যূ। "And he that blasphemeth the name of lord, he shall surely be put to death and all the congregation shall certainly stone him.(Lev 24:16) অর্থাৎ-যে ইশ্বরনিন্দা করবে, তাকে সবাই মিলে প্রস্তরাঘাত করে মেরে ফেলবে। খৃষ্ট-ধর্মে 'ইশ্বর' এবং 'পবিত্র-আত্মার' জন্য ইহুদিদের ইশ্বর নিন্দার আইনই বলবৎ করা হয়েছে। "যে মনুষ্য-পুত্রের বিরুদ্ধে কথা বলবে, তাকে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু যে পবিত্র-আত্মার বিরুদ্ধে বলবে তাকে ক্ষমা করা হবে না। (লুক: ১০:১২)।" অর্থাৎ-নবী যে মনুষ্য-পুত্র, তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে বা করলে তার জন্য কোন শাস্তি নেই। হিন্দু ধর্মে সম্মানিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কথা বলার শাস্তি মৃত্যূদন্ড রাখা হয়েছে। বেদে লেখা আছে "যদি কোন শূদ্র জেনে-বুঝে কোন পন্ডিতের অবমাননা করে, তবে রাজার দায়িত্ব হলো, তাকে শারীরিকভাবে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেয়া বরং মৃত্যূদন্ড দিয়ে শিক্ষনীয়-দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা।" (মনুস্মৃতি ২৪৮:৯) জানা গেলো, হিন্দু-ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে মানুষ তথা সন্মানিত- ব্যক্তিবর্গের অবমাননার শাস্তির কোন বিধান নেই।

BLASPHEMY শব্দের বিপরীতে আরবী ভাষায় ***'সব্বা'*** ও ***'শাতামা'*** শব্দদয়ের ব্যবহার হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে ***'শাতামা'*** শব্দটি মোটেও ব্যবহার করা হয়নি। 'সাব্বা' শব্দটি পবিত্র কুরআনে মাত্র একবার, সূরা আল আনআমের ১০৯ নম্বর আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে। তাও আবার উপদেশের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তোমরা প্রতিমা-পূজারীদের প্রতিমাকে গালমন্দ করো না। ইসলাম নৈতিকভাবে এবং নীতিগতভাবে ইশ্বর-নিন্দার বিরুদ্ধে নিন্দা ও ধিক্কার জানায়। কিন্তু ইশ্বর-নিন্দার জন্য কোন জাগতিক শাস্তিদান সমর্থন করে না। আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে যারা কথা বলে, পবিত্র কুরআনে তাদের জন্য কোন জাগতিক শাস্তির বিধান নেই । এর শাস্তি আল্লাহ্ স্বয়ং নিজের হাতে রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন " নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া যত (পাপ) আছে, তা তিনি যার জন্য চান, ক্ষমা করে দেন। আর যে আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করে, সে নিশ্চয় মহাপাপের উদ্ভাবন করেছে। (সূরা আন নিসা: ৪৯) । আল্লাহ এ-সম্পর্কে আরো বলেন "আর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে (উপাস্যরূপে) ডাকে, তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না। নতুবা তারা শত্রুতাবশত, না জেনে, আল্লাহকেই গালমন্দ করবে" (সূরা আল আনআম: ১০৯)। এ আয়াতে মুসলমানদের সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, তোমরা পৌত্তলিকদের মূর্তি এবং তাদের কল্পিত-দেবতাগুলোর নিন্দা করবে না। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অনুরূপ কাজ করে বসে, তবে অন্যরাও প্রতিশোধমূলকভাবে তোমাদের আল্লাহ্‌র নিন্দা করবে। এ আয়াতের আলোকে মহানবী (সা.) মক্কার মুশরিকদের সাথে যে আদর্শ দেখিয়েছেন, তা আমাদের জন্য পাথেয়। অর্থাৎ-এ আয়াতে আল্লাহ্ তাঁর শাস্তির ভয় দেখিয়ে এবং মানুষকে উপদেশ দিয়ে এ সব থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করার কথা বলেছেন। আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রসূলগণও এভাবেই মানুষকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে গেছেন। আর যারা বিরত হয়নি, তাদের বিষয়টি তারা আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দিয়েছেন।

ইসলাম-ধর্মে মানবাধিকারকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ইসলাম সাম্য, সহনশীলতা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা- প্রদর্শন,মানবপ্রেম, অন্য-ধর্মের সম্মানিত-ব্যক্তিবর্গকে সম্মান করা, ক্ষমা, ধৈর্য, ন্যায়-বিচার, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, উত্তম ব্যবহার করার শিক্ষা দেয়। ইসলাম সৌহার্দ্র-পূর্ণ পরিবেশে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সহাবস্থানের শিক্ষা দেয়। মিথ্যাচার, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া,

হিংসা,বিদ্বেষ,অন্যকে অবজ্ঞা বা তুচ্ছ জ্ঞান করা, কাউকে কটাক্ষ করা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা,অপবাদ দেয়া, কুৎসা করা, ইত্যাদি কঠোর ভাবে নিষেধ করেছে। পবিত্র কুরআনে কঠোর ভাষায় অশিষ্ট-আচরণ এবং অশালীন-কথাবার্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, অন্যদের অনুভূতিতে আঘাত করার বিরুদ্ধে কথা বলেছে। ইসলাম ইহজগতে এ-বিষয়ে শাস্তিদানকে সমর্থন করে না এবং এ-বিষয়ে কাউকে কোন-ধরনের ক্ষমতা প্রদান করে না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন "আর তিনি তোমাদের জন্য এ-কিতাবে অবশ্যই এ-বিধান অবতীর্ণ করে দিয়েছেন যে, তোমরা যখন আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতে এবং এর প্রতি বিদ্রূপ করতে শোন, তখন তোমরা তাদের (অর্থাৎ-বিদ্রূপকারীদের) সাথে বসো না, এমনকি তারা অন্য কথায় মগ্ন হয়ে গেলেও (বসবে) না। অন্যথায়, তোমরা অবশ্যই তাদের মতই হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুনাফিক ও কাফির, সবাইকে জাহান্নামে একত্র করে ছাড়বেন (সূরা নিসা: ১৪১)। অর্থাৎ-এমন লোকদের সাথে চলাফেরা করতে নিষেধ করেছে, বলতে গেলে তাদেরকে বয়কট করতে আদেশ দিচ্ছে।

নবীদের অবমাননা প্রসঙ্গে: আজকাল মুসলিম-বিশ্বে সবচেয়ে স্পর্শকাতর-বিষয় হলো, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে ব্লাসফেমী। বিষয়টি মুসলমানদের নিকট আল্লাহ্‌র-নিন্দার চাইতেও বেশী স্পর্শকাতর। এ-বিষয়ে পবিত্র-কুরআন আম্বিয়াদের প্রতি তাঁর অস্বীকারকারীদের আচরণের কথা বিষদভাবে তুলে ধরে আমাদের জন্য স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছে। পবিত্র-কুরআন বলে, নবীর বিরোধীরা নবীদেরকে নানাভাবে যাতনা দিয়েছে। তাঁদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে, গালমন্দ দিয়েছে। কিন্তু নবীগণ সর্বদাই তাদের সাথে উত্তম-আচরণ করেছেন। কুরআন, নবীদের সাথে সমসাময়িক লোকদের আচরন সম্পর্কে আমাদেরকে যা জানিয়েছে, সংক্ষিপ্তভাবে তা নিম্নরূপ :–

নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা : "আমরা একের পর এক আমাদের রসূল পাঠিয়েছিলাম। কোন জাতির কাছে যখনই তাদের রসূল আসতো, তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করতো। অতএব, আমরা তাদেরকে একের পর এক (ধ্বংসের মুখে) ঠেলে দিলাম এবং আমরা তাদেরকে (অতীতের) কাহিনীতে পরিণত করে দিলাম" (সূরা আল্ মুমেনূন: ৪৫)।

নবীদের বিরোধীতা: "আর এভাবে অপরাধীদের মাঝ থেকে আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানিয়ে থাকি" (সূরা আল ফুরকান: ৩২)।

নবীদের যাদুকর ও পাগল বলা: "এদের পূর্ববর্তীদের কাছেও যত রসূলই এসেছিল তারাও এমনটিই বলেছিল, 'এ এক যাদুকর' বা পাগল" (সূরা যারিয়াত: ৫৩)।

নবীদের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা: "আর তাদের কাছে এমন কোন নবী আসেনি, যার সাথে তারা হাসিবিদ্রূপ করেনি।" (সূরা আয যুখরুফ: ৮)

"হায় আক্ষেপ মানবজাতির জন্য ! তাদের কাছে যখনই কোন রসূল আসে, তারা তাকে নিয়ে হাসিবিদ্রূপ করে।" (সূরা ইয়াসীন: ৩১)

পূর্ববর্তী সব নবীদের এসব আচরণের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং কোন রসূলই এসব অবস্থা হতে পরিত্রাণ পান নি। তাই, আল্লাহ তা'লা তাঁর প্রিয়-রসূল মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে নবী, তোমাকেও এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে, তবে আমি তাদেরকে তাদের এই অপরাধের শাস্তি অবশ্যই দিব।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "আর নিশ্চয় তোমার পূর্বেও রসূলদের সাথে হাসিবিদ্রূপ করা হয়েছে। অতএব, যারা এসব (রসূলের) সাথে হাসি-বিদ্রূপ করতো, সেইসব বিষয়ই তাদেরকে ঘিরে ফেললো, যা নিয়ে তারা হাসিবিদ্রূপ করতো" (সূরা আল আম্বিয়া: ৪২)। "আর নিশ্চয় তোমার পূর্বেও রসূলদেরকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা এবং কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধরেছিল। পরিশেষে তাদের কাছে আমাদের সাহায্য এসে গেল। আর আল্লাহ্‌র কথার পরিবর্তনকারী কেউ নেই" (সূরা আল আনআম: ৩৫)।

"নিশ্চয় বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমরাই তোমার জন্য যথেষ্ট" (সূরা আল হিজর: ৯৬)। " আর তুমি কাফিরদের ও মুনাফিকদের অনুসরণ করো না এবং তাদের দেয়া দু:খকষ্ট অগ্রাহ্য করে চল আর আল্লাহর ওপর ভরসা কর। কেননা, কার্যনির্বাহকরূপে আল্লাহই যথেষ্ট" (সূরা আল আহযাব: ৪৯)।

উপরোক্ত আয়াত হতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) কে কাফেরদের অশ্লীল-কথাবার্তা ও অত্যাচার-নিপীড়নের সময় ধৈর্য ধরতে এবং তাঁর ওপর ভরসা করতে বলেছেন। কোন জাগতিক-শাস্তি দেয়ার কথা বলেন নি। বরং এদের বিষয় আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেয়ার কথা বলেছেন।

রসূল-অবমাননার জাগতিক-কোন শাস্তির কথা কুরআনে উল্লেখ নেই: পবিত্র কুরআনে, নবীদের যুগে তিন ধরনের লোক হয়ে থাকে বলে উল্লেখ আছে। কাফের, মুনাফেক এবং মুমিন। কাফেররা নবীদেরকে অস্বীকার করে থাকে এবং নবী ও তাঁর মান্যকারীদের ওপর নানা-ধরনের অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে থাকে। মহানবী (সা.) কে কাফের ও মুনাফিকরা নানাভাবে অপমান করেছে, গালমন্দ করেছে,তাঁর পবিত্র-শিরে ছাই দিয়েছে, নামাযের সময় তাঁর (সা.) পিঠে উটের নাড়িভুড়ি রেখে দিয়েছে, খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করে দিয়েছে, রাস্তায় কাটা ছড়িয়ে দিয়েছে, হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে এবং হত্যা করতে চেষ্টা করেছে,যুদ্ধের ময়দানে রক্তাক্ত করেছে, আবতার (নির্বংশ), যাদুকর, পাগল, ইত্যাদি বলেছে। এতসব হওয়া সত্ত্বেও তিনি (সা.) তাদেরকে কোন জাগতিক-শাস্তি দেন নি এবং তাঁর অনুসারীদেরও দিতে দেন নি।আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি (সা.) এমন লোকদেরকেও ক্ষমা করেছেন এবং তাদের কর্মকান্ডকে উপেক্ষা করেছেন।

মহানবী (সা.)-এর সম্মানহানীকারী এসব কাফের,ইহুদি,খৃষ্টান ও মুনাফেকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে এ বলে আস্বস্ত করেছেন ও নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন, " যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, নিশ্চয় আল্লাহ্ ইহকালে এবং পরকালেও তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। আর তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন" (সূরা আল আহযাব : ৫৮)। কোন ধরনের জাগতিক- শাস্তি দেবার আদেশ না দিয়ে তাদেরকে শায়েস্তা করার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লা নিজের হাতে নিয়েছেন এবং তাঁর হাবীবকে ধৈর্য ধরতে বলেছেন।

সীরাতের আলোকে রসূল অবমাননরা শাস্তি: মহানবী (সা.)-এর সীরাত পাঠ করলে জানা যায়, তিনি মূর্তিমান দয়া ও করুনা ছিলেন। তিনি (সা.) 'রাহমাতুললিল আলামীন' ছিলেন। পৃথিবীবাসী তাঁর (সা.) করুণাবারি দ্বারা সিঞ্চিত। তাঁর (সা.) কাছে বন্ধু বা শত্রু

বলে কোন ভেদাভেদ ছিল না। 'মক্কা বিজয়' এর এক জ্যাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত। গুটিকয়েক হত্যাযোগ্য ভয়ংকর অপরাধী ছাড়া বাকি সবাই তাঁর দয়া ও কৃপার চাদরে আবৃত হয়েছিল।

মুনাফেকদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল রসূল-নিন্দা-র ঘটনা ঘটানোর পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) এর প্রতিক্রিয়া আজ আমাদের জন্য পাথেয়। একবার এক যুদ্ধের অভিযান থেকে ফেরার সময়,আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল অন্যান্যদের মধ্যে ঘোষণা করেছিল যে, তারা মদীনায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই মদীনাবাসীদের মধ্যেকার সর্বোত্তম ব্যক্তি সেখানকার সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকে [নাউযুবিল্লাহ, মহানবী (সা.)-কে] মদীনা থেকে বহিস্কার করে দেবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "তারা বলে, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই, তাহলে, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি অবশ্যই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সেখান থেকে বের করে দেবে। অথচ (প্রকৃত) সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁর রসূল এবং মুমেনদের জন্য। কিন্তু মুনাফেকরা তা জানেনা" (সূরা আল মুনাফেকুন: ৯)।

আমরা সবাই জানি, এই অবমাননাজনক কথা মুনাফেক-নেতা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে বলেছিলো। সাহাবাগণ ঘৃণায় এবং ক্রোধে এত বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে, অনুমতি পেলে তারা তৎক্ষনাৎ আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে টুকরো টুকরো করে ফেলতেন। আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর পুত্র সাহাবীদের ঘৃনা, মর্মবেদনা ও ক্ষোভকে অনুভব করে মহানবী (সা.) এর কাছে এসে বললো, অপর কেউ তার পিতাকে হত্যা করলে সে হয়তো কখনও অবচেতন মনে তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা করতে পারে, তাই সে তার পিতাকে নিজের হাতে হত্যা করে এ-অপরাধের শাস্তি দেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছে। কিন্তু মহানবী (সা.) আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর পুত্রের সেই প্রার্থনা মন্‌জুর করেন নি এবং তাঁর সাহাবীদেরকেও কোন শাস্তিদানের অনুমতি দেননি। রসূল অবমাননাকারী এই অপরাধী মদীনাতে শান্তিতে বসবাস করে স্বাভাবিকভাবে মারা গেল। সে সময় মহানবী (সা.) তাঁর পবিত্র জামা (যুব্বা) খুলে দিলেন এবং তার পুত্রকে তা দিয়ে তার পিতার কাফন তৈরি করতে বললেন, আর আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুলের জানাযার নামাযে ইমামতী করার জন্যেও তৈরী হয়ে গেলেন। সাহাবীদের মনে আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুলের জঘন্য অপরাধটি ক্ষমার অযোগ্য ছিল। তাই আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুলের প্রতি মহানবী (সা.) এর কৃপা ও দয়ার এ-আচরণ তারা মেনে নিতে পারছিলেন না। সাহাবীদের এই চাপা-ক্ষোভ ও মর্মবেদনাকে হযরত ওমর (রা.) বলেই ফেললেন। হযরত ওমর (রা.) মহানবী (সা.) এর সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করে তাঁর (সা.) এ সিদ্ধান্ত বদলাবার অনুরোধ জানালেন। এ-আয়াতে এমন কিছু-সংখ্যক মুনাফেকের কথা বলা আছে, যাদের ক্ষমার জন্য সত্তর বার ইস্তেগফার করলেও তা কবুল করা হবে না বলে বলা হয়েছে। মহানবী (সা.) মুচকি হাসলেন এবং বললেন, 'ওমর, পথ ছড়ো, আমি তোমার চেয়ে ভালো জানি। আমি তার জন্য সত্তর বারের বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করবো' (বুখারী)। এ ঘটনা আজ সমগ্র মুসলিম-বিশ্বের জন্য আদর্শ ও অনুকরনীয়।

"যারা খোদাকে ভয় না করে অন্যায়ভাবে আমাদের সন্মানিত নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-কে মন্দ-ভাষায় উল্লেখ করে, তাঁর প্রতি অপবিত্র-অপবাদ দেয় এবং অশ্লীল-ভাষা প্রয়োগ করা থেকে বিরত হয় না, তাদের সাথে আমরা কীভাবে সন্ধি করতে পারি? আমি সত্য সত্য বলছি, আমরা মরুভুমির সাপ ও জঙ্গলের বাঘের সাথে সন্ধি করতে পারি, কিন্তু আমরা তাদের সাথে সন্ধি করতে পারি না, যারা আমাদের সেই প্রিয় নবীকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে, যিনি আমাদের প্রাণ ও মা-বাপের চেয়েও বেশী প্রিয়। খোদা আমাদেরকে ইসলামে মৃত্যু দিন। আমরা এরূপ কাজ করতে চাই না, যাতে ঈমান চলে যায়"

রসূল নিন্দার শাস্তি মৃত্যুদন্ড বলে যারা দাবী করে , তারা ইসলামের ইতিহাস থেকে এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করে থাকেন। ইসলামের ইতিহাস থেকে পনের জন এমন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, যাদেরকে নাকি মহানবী (সা.) মৃত্যুদন্ড দিয়েছেন। এখানে এ-ব্যাপারে আলোচনা করা সম্ভব নয়। মহানবী (সা.) যে কয়জনকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছেন, তারা যে খুন ও অন্যান্য জঘন্য-অপরাধের জন্য দন্ডিত হয়েছে, তা নিশ্চিত। তবে আল্লাহ বা রসূল অবমাননার অপরাধে তিনি (সা.) তাদেরকে এ-শাস্তি দেন নি, তা-ধ্রুব সত্য। মক্কা বিজয়ের সময় মক্কার জঘন্য অপরাধীদের সাথে মহানবী (সা.) এর ক্ষমার আচরন সবারই জানা। যার দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, আর না-ই বা কখনও খুঁজে পাওয়া যাবে।

এর সমাধান কি: আজ মুসলিম-বিশ্বের প্রতিটি দেশে 'ইউসুফ-জুলেখা'-র প্রেম-উপাখ্যান লিখিত আকারে বিদ্যমান। তথাকথিত বড় বড় আলেম এসব ঘটনার চটকদার বয়ান করে থাকেন, আর অনেকেই তা খুব শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে শোনে। এ ছাড়া, আরো অনেক পবিত্র-নবীদের সম্পর্কে নানা অলীক ঘটনা আমাদের বই-পুস্তকে মূদ্রিত ও আমাদের অনেকের বিশ্বাসে তা বিদ্যমান। কেউকি কখনো ভেবে দেখেছে, আসলে আমরা কি করছি,কি বলছি এবং কি বিশ্বাস করছি? ***যারা এসব বলে এবং এরূপ বিশ্বাস করে, তারা কী নিজেদের অজান্তে রসূল-অবমাননাকারী হয়ে যাচ্ছেন না!*** যিনিই আল্লাহর নবী, তাঁর দ্বারা এহেন কাজ, তা আহমদীয়া মুসলিম জামাত কক্ষনও বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ, আমাদের নিজেদের সংশোধনের প্রয়োজন। আমাদের কাজ এবং আমাদের কথা ইসলামের কোন শত্রুকে যেন মন্দ কিছু বলার কোন সূযোগ করে না দেয়। মহানবী (সা.) এর মহান জীবনাদর্শকে অনুকরণ করে আমরা যেন নিজেদের চলার পথ তৈরী করি। পবিত্র কুরআন এহেন লোকদেরকে এড়িয়ে যেতে বলেছে। মহানবী (সা.) এর জীবনাদর্শও তাই বলে। পবিত্র কুরআন বলে, "নিশ্চয় পুণ্য মন্দকে দূর করে দেয়।(সূরা হুদ: ১১৫)"। পবিত্র কুরআন আমাদেরকে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে, পুণ্য-কর্ম দ্বারা এই মন্দকে দূর করতে হবে। কাফের ও ইহুদীদের খারাপ-কথার উত্তরে মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.) কে বললেন ' তারা আমাকে মুযাম্মাম (অর্থাৎ-ধীকৃত) বলে ডাকে, অথচ আল্লাহ তা'লা আমার নাম মুহাম্মদ (অতীব প্রশংসিত) রেখেছেন। (বুখারী কিতাবুল মানাকেব)। এ-হাদীস আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে, এহেন মন্দ-কর্মের সময় আমাদেরকে মহানবী (সা.)

এর সীরাতকে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে এবং তাঁর (সা.) মহান আদর্শকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর শিক্ষা: পন্ডিত লেখরাম নামের এক আর্য মহনবী (সা.)কে গাল-মন্দ করতো। একদা তার সাথে সাক্ষাৎ হলে এ অভিশপ্ত-ব্যক্তিটি তাঁকে (আ.)কে সালাম দেয়। তিনি (আ.) 'সালাম' এর কোন উত্তর দেন নি। তিনি (আ.) বললেন "সে আমার নেতা ও প্রভূকে গাল মন্দ করে, আর আমাকে সালাম দিতে আসে!" আর্যদের এক অনুষ্ঠানে ইমাম মাহদী (আ.) এর কিছু সাহাবীকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই অনুষ্ঠানে মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে আর্য-বক্তারা কটুক্তি করে। তিনি (সা.) এ-ঘটনা শোনার পর তাদের ওপর রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'তোমরা কেন তাৎক্ষনিকভাবে সেখান থেকে উঠে আসোনি'। তিনি (আ.) বলেন," ধর্ম হচ্ছে খোদার নিষিদ্ধ-বস্তু থেকে বিরত থাকা, তাঁর সন্তুষ্টির পথে দৌড়ানো, তাঁর সব সৃষ্ট-জীবের হিত ও কল্যাণ সাধন করা, তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো,পৃথিবীর সব পবিত্র-নবী ও রসূলকে তাঁদের নিজ নিজ সময়ে খোদার পক্ষ থেকে আগত নবী ও সংস্কারক বলে স্বীকার করা, তাদের মধ্যে তারতম্য না করা এবং মানব জাতির সেবা করা। এটাই আমাদের ধর্মের সারমর্ম।

কিন্তু যারা খোদাকে ভয় না করে অন্যায়ভাবে আমাদের সন্মানিত নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে মন্দ-ভাষায় উল্লেখ করে, তাঁর প্রতি অপবিত্র-অপবাদ দেয় এবং অশ্লীল-ভাষা প্রয়োগ করা থেকে বিরত হয় না, তাদের সাথে আমরা কীভাবে সন্ধি করতে পারি? আমি সত্য সত্য বলছি, আমরা মরুভুমির সাপ ও জঙ্গলের বাঘের সাথে সন্ধি করতে পারি, কিন্তু আমরা তাদের সাথে সন্ধি করতে পারি না, যারা আমাদের সেই প্রিয় নবীকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে, যিনি আমাদের প্রাণ ও মা-বাপের চেয়েও বেশী প্রিয়। খোদা আমাদেরকে ইসলামে মৃত্যু দিন। আমরা এরূপ কাজ করতে চাই না, যাতে ঈমান চলে যায়। (পয়গামে সুলহ)"।

রসূল-অবমাননার প্রতিকারের জন্য তিনি (আ.) তৎকালীন ইংরেজ-সরকারের কাছে লিখিতভাবে আবেদন করেন এবং তাতে উল্লেখ করেন, এ-বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে তা কার্যকর করা সরকারের দায়িত্ব। রসূল-অবমাননার প্রতিকারের পন্থা তিনি তার পুস্তকে বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর (আ.) রচিত পুস্তক 'পয়গামে সুলাহ' ও 'কিতাবুল বারিয়্যা' । এ বিষয়ে তিনি (আ.) তার বক্তব্য বিজ্ঞাপন আকারেও প্রকাশ করে তৎকালীন ভারতবর্ষে বিতরন করান এবং সরকারের কাছেও তা উপস্থাপন করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এর যুগে এক আর্য মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে একটি বই প্রকাশ করে। তিনি (রা.) এ-ব্যাপারে প্রতিকারের জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাত এবং মুসলমানদের দিক-নির্দেশনা দেন। তার প্রচেষ্টায় আইন সংশোধন হয় এবং ইন্ডিয়ান পেনাল কোড ২৯৫-এ ধারা হিসেবে তা সংযোজিত হয়। তার (রা.) এ-প্রচেষ্টা সে সময়ে ফলপ্রসূ হয়। তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় এ বিষয়ে তার (রা.) প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। রসূল-অবমাননার এহেন হীন-কর্মকান্ডের প্রতিকারের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) সারা বিশ্বের আহমদীদের দিক নির্দেশনা দিয়ে বলেন, "মহানবী (সা.) এর জীবনি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় লোকেরা মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে লেখার সূযোগ পায়। আর তারা মনে করে, তাদের মত অন্যরাও অজ্ঞ। তাই এর একমাত্র প্রতিকার হলো মহানবী (সা.) এর সীরাতের ওপর অধিক সংখ্যায় বক্তৃতা দেয়া ও তা শোনার ব্যাবস্থা করা।" এ পরিপ্রেক্ষিতে সে সময়ে তিনি (রা.) সারা ভারতবর্ষে একই তারিখে সীরাতুন নবী (সা.) এর জলসা করান। তা ছাড়া তিনি সর্ব-ধর্ম সম্মেলন করার জন্য জামাতকে আদেশ দেন।

সালমান রুশদীর কুখ্যাত বই 'স্যাটানিক ভার্সেসের' প্রকাশের সময়ও আহমদীয়া মুসলিম জামাতের তৎকালীন খলীফা এর প্রতিকারের জন্য বলিষ্ঠ ভুমিকা রাখেন এবং বিশ্বে প্রশংসিত হন।

গত ২১ শে সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে বিবিসি ন্যাশনাল নিউজ, বিবিসি নিউজ নাইট, স্কাই নিউজ, স্কাই এরাবিক, রয়টার্স, দি প্রেস এসোসিয়েশনস বহু সংবাদ-মাধ্যম যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত হীন-চলচিত্র সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য যুগ-খলীফার সাক্ষাৎকার নেয়। এর পূর্বে তিনি (আই.) খুতবায় এ-বিষয়ে বিশদভাবে তার বক্তব্য তুলে ধরেন। এ-সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন," এটা হচ্ছে ইসলামকে পরাজিত করার ব্যাপারে তাদের অক্ষমতা, যা এর বিরোধীদেরকে এ-ধরণের জঘন্য কাজের আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। আর এ হীন কর্মকে তারা তথাকথিত বাক্ স্বাধীনতার আদলে সাজাতে চেয়েছে।" বিশ্বের নেতৃবৃন্দ এবং জনপ্রতিনিধিবৃন্দকে সম্বোধন করে তিনি বলেন " বাক্-স্বাধীনতার নামে সমগ্র বিশ্বের শান্তিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তারা যেন এগিয়ে আসে। তারা এহেন হীনকর্মকে কোনভাবেই যেন সমর্থন না করে।" মুসলিম বিশ্বকে,"একটি সম্মিলিত এবং সুচিন্তিত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের" আহব্বান জানান। তিনি বলেন, "পশ্চিমা-দেশগুলোতে বসবাসরত মুসলমানদের এবং মুসলিম সরকারগুলোর উচিত, একতাবদ্ধ হওয়া এবং ইসলাম ও পবিত্র নবী (সা.) এর প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষামালাকে সমগ্র বিশ্বে সম্প্রসারিত করা।"

তিনি বলেন "মুসলমানদের একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন , কোন চরমপন্থা এ-ধরনের প্ররোচনার প্রতিকার নয়। প্রকৃত-প্রতিকার হবে নিজেকে সংশোধন করা এবং মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি দরূদ প্রেরনের মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের অভিসম্পাতের জবাব দেয়া।" তিনি বলেন, "এটা স্মরণ রাখা উচিত, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) বলেছেন, 'সব বিজয় আকাশ থেকে আসে এবং আকাশে এ সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়ে আছে।' সেই নবী (সা.) যাকে বিশ্ব বিদ্রূপ করার চেষ্টা করছে, পরিণামে তাঁকেই এ পৃথিবীতে এক মহা-বিজয় দান করা হবে। আর এই বিজয় লাভ হবে মানুষের হৃদয় জয় করার মাধ্যমে।"

উপরোক্ত আলোচনা হতে এ বিষয়টি প্রমানিত যে, মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধাচারণনকারীদের শাস্তি আল্লাহ্‌র হাতে। কুখ্যাত চলচিত্রের বিরুদ্ধে আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে, তা হলো কুরআন ও হাদীস-সম্মত প্রতিক্রিয়া।

আসুন, আমরা সবাই মহা নবী (সা.) এর ওপর অসংখ্যবার দরূদ প্রেরণ করে এই দোয়া করি, হে আল্লাহ, তুমি বিশ্ববাসীকে মহনবী (সা.) এর পতাকা-তলে একত্র করে দাও। বিশ্ববাসীকে মহনবী (সা.) কে মেনে নিয়ে তাঁর ওপর দরূদ প্রেরণ করার সামর্থ দাও।

يا رب صل على نبيک دائما
فى هذه الدنيا و بعث ثانى

শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মাহমুদ আহমদ সুমন

সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলাম নামক ধর্মকে মহান আল্লাহ্ তা'লা এ পৃথিবীতে তাঁর প্রিয় নবী, বিশ্ব নবী, সর্ব জাতির নবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ শরিয়তবাহী নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে শান্তির অমিয়-বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন। বিশ্বনিয়ন্ত্রণকর্তা সব সময়ই মানুষকে শান্তির পথে আহ্বান করে থাকে। প্রকৃত-শান্তির ধারক ও বাহক ইসলাম ধর্মের নিষ্ঠাবান, শান্তিপ্রিয়-অনুসারী মুসলমান কখনো সমাজের ও দেশের অশান্তির কারণ হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গীন-দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন, আর রসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে বানিয়েছেন সকলের জন্য অনুসরণীয়-আদর্শ। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এই মহান রসূলের উত্তম চরিত্রের সার্টিফিকেট দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে বলেছেন: নিশ্চয় তুমি মহান চারিত্রিক গুণাবলীর ওপর অধিষ্ঠিত (৬৮: ৫)। হযরত রসূল করীম (সা.)-এর অনুসরণের মাধ্যমে যে-কোন ব্যক্তির জীবন শান্তিময় হতে পারে, হোক সে ইহুদি, খৃষ্টান বা যে-কোন ধর্মের অনুসারী। আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) কোন বিশেষ-জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য পাঠান নি বরং তাঁর (সা.) আগমন সবার জন্য, তিনি সমগ্র মানব-জাতির রসূল।

সম্প্রতি মার্কিন চলচ্চিত্র নির্মাতা স্যাম বাসিল ও তার কলাকুশলীরা 'ইনোসেন্স অব মুসলিম'-নামক চলচ্চিত্রে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-কে অত্যন্ত অশালীন ও বিকৃতভাবে বিদ্রূপ করেছে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং পবিত্র গ্রন্থ আল্ কুরআনকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করলেই কি বিকৃত হয়ে যাবে? বিষয়টি কি এতোই সহজ? যেই মহান ব্যক্তির জন্য এ-জগৎ সৃষ্টি, তাঁর চরিত্রের ওপর আঘাত হানবে এমন সাহস কি কারো আছে? এমন একটি ছবি কেন, হাজার ছবি নির্মাণ করলেও শ্রেষ্ঠ-নবীর সম্মানের এক চুল পরিমাণও বেঘাত ঘটবে না। কারণ, এই মহান নবীর সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ যেখানে এই ঘাষণা দিয়েছেন যে, নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপরে অধিষ্ঠিত। তাই, যারা এমন গর্হিত কাজে জরিত, তারা ইসলামের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, বরং তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এটাও দেখা উচিৎ, কোন্ ধরণের এবং কোন পর্যায়ের ব্যক্তিরা এ ধরণের চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছে। যারা এটি নির্মাণ করল, তাদের চরিত্র কেমন? জানা যায়, তাদের কারোরই চরিত্র ঠিক নেই, আর কোন ভাল-চরিত্রের অধিকারী, সে যে-ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন, সে এমন কাজ করতে পারে না।

এ ছবির নির্মাতারাতো অশ্লিল ও নগ্ন-ছবি নির্মাণ করে থাকে, এদের মত লম্পটদের কথায় কি ইসলাম কলঙ্কিত হয়ে যাবে? তা কখনো হতে পারে না। কারণ, ইসলামই কেবল একমাত্র পরিপূর্ণ ধর্ম। তবে আমরা এধরনের গর্হিত কাজের শক্ত নিন্দা জানাই এবং খোদার দরবারে তাদেরকে ধৃত করার জন্য দোয়া করি। যখন কেউ ইসলামের অবমাননা, কুরআনের অবমাননা এবং রাসূল করীম (সা.)-এর অবমাননা করে, এর প্রতিবাদ করা অবশ্যই প্রতিটি মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। তবে এ প্রতিবাদের ধরণ হবে শ্রেষ্ঠ নবীর অনুপম আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়ে। কোন দেশের পতাকা পুড়িয়ে বা কোন দেশের রাষ্ট্রদূতের উপর হামলা চালিয়ে বা হত্যা করে অথবা অগ্নিসংযোগ ও অপহরণ করে নয়। কারণ, এগুলোর কোনটাই ইসলাম আমাদেরকে অনুমতি দেয় না। যেভাবে আমাদের প্রিয়-খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) গত ২১ সেপ্টেম্বরের জুমুআর খুতবায় প্রতিবাদের পদ্ধতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এই পদ্ধতিই সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র গ্রহণ করা উচিৎ, আর এতেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

আমাদেরকে ইসলামের প্রকৃত-সৌন্দর্য, কুরআনের শিক্ষা এবং বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ সারা বিশ্বের মাঝে ফুটিয়ে তুলতে হবে। আমরা যদি প্রতিবাদ করতে গিয়ে ইসলামের আদর্শ ভুলে জুলুম- নির্যাতনের রাস্তা অবলম্বন করি, তাহলে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা এটা বলতে সাহস পাবে যে, মুসলমানরা আসলেই সন্ত্রাসী, আর এরাই পৃথিবীতে সন্ত্রাসী-কার্যক্রম চালাচ্ছে। তাই তাদেরকে কোন ভাবেই অভিযোগের সুযোগ দেয়া আমাদের মোটেও ঠিক হবে না। আমরা যদি প্রতিবাদ করতে গিয়ে দেশের রাস্তা বন্ধ করে রেখে জনগণকে কষ্ট দেই, তা কিন্তু শ্রেষ্ঠ-নবীর আদর্শের পরিপন্থি হবে। ইসলামের বিরুদ্ধে যখন কোন বিষয়ে অভিযোগ হানা হয়, তখন প্রতিটি মুসলমানের হৃদয় কাঁদে এবং ব্যথা-জর্জরিত হয়ে থাকে।

যারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে অশালীন কথাবার্তা উত্থাপন করে, তারা কি এটা জানে না যে, তিনি তো শুধু ইসলামের অনুসারীদের নবী নন, তিনি তো সারা বিশ্বের সকল জাতি এবং সকল ধর্মের নবী। আর আল্লাহ্ তা'লা এই মহান নবীকে সমগ্র বিশ্বের জন্য শান্তি ও রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন। এই নবীর আগমন- বার্তা সকল নবীরাই (আ.) দিয়ে গেছেন এবং অন্যান্য নবীগণ এই নবীর উম্মত হওয়ার ইচ্ছাও পোষন করেছেন।

নাউযুবিল্লাহ! আজ সেই মহান রসূলের চরিত্রের উপর আঘাত হানা হচ্ছে, যিনি পশুতুল্য মানুষকে ফেরেশতায় রূপান্তরিত করেছিলেন। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগে যখন মানব সমাজ তাদের নিজস্ব পরিচয় মনুষত্ব হারিয়ে ইচ্ছা মাফিক ও স্বেচ্ছাচারী জীবন নিয়ে মত্ত ছিল, ঠিক তখনই কোরাইশ বংশের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আরব জাহান, তথা বিশ্ব-মানবকূলের জন্য শান্তির বাণী দিয়ে

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)–কে প্রেরণ করেন । জন্মলগ্ন থেকে যাঁর উছিলায় শান্তির স্বপক্ষে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশ্বময় রহমত আসতে থাকে। কতই না চমৎকার তাঁর আদর্শ, বিশ্বস্থতা, একনিষ্ঠতা, সত্য, ন্যায় এবং ইসলামের শান্তির কথা বলে কোটি কোটি হৃদয়কে আকর্ষিত করেছিলেন। সমাজে তাঁর (সা.) লড়াই ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার লড়াই, আর এ লড়াই ছিল ভালবাসার লড়াই।

তিনি (সা.) প্রকৃত ইসলামী দর্শন, কুরআন মাফিক বিশাল এলাকা গড়ে তুলতে শাসক হিসেবে, যোদ্ধা হিসেবে, সঠিক সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষেত্রে অসাধারণ দৃষ্টান্ত তাঁর উম্মতের জন্য রেখে গেছেন। তিনি (সা.) সমাজে কোন-ধরনের অশান্তির লেশমাত্র রেখে যান নি। অন্ধকার সমাজ ছিল, যেখানে কোন আলো দেখা যেত না, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশটির বুকে আলো জ্বালিয়ে দেখিয়েছেন, ইসলাম আসলেই শান্তির ও কল্যাণের ধর্ম। তিনি (সা.) শুধু মাত্র একটি সুন্দর সমাজই প্রতিষ্ঠা করেন নাই, বরং প্রকৃত-ইসলামের শিক্ষা কি? ইসলাম পালন করলে কি লাভ এবং ইসলাম পৃথিবীতে কেন এসেছে, এ সব কিছুই তিনি (সা.) তাঁর কর্ম দ্বারা শিখিয়ে গিয়েছেন।

ইসলাম প্রকৃতই যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তির নিশ্চয়তা দেয়, তা-ও তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। ইসলামের গৌরবজনক ইতিহাস, অনুশাসন, ঐতিহ্যবাহী জীবন-ব্যবস্থায় নারীর মূল্যায়ণ, পুরুষসহ সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রশ্ন ও প্রেক্ষিত এবং সমাধান দেখে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই ঈমান এনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। সবাই এ কথাও বলতে বাধ্য হয়েছিল, ইসলামই একমাত্র শান্তির ধর্ম হতে পারে। তাই সবাই ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসেবেই গ্রহণ করেছে। এই শান্তির ধর্মে কোন ধরণের বল প্রয়োগের শিক্ষা নেই। ইসলাম কাউকে হত্যা করার শিক্ষা দেয় না। হত্যার ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা হল–"আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে এর প্রতিফল হবে জাহান্নাম। সেখান সে দীর্ঘকাল থাকবে। আর আল্লাহ্‌ তার প্রতি রাগান্বিত। তিনি তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য এক মহা আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন (সূরা আন নিসা : ৯৪)। কাউকে হত্যার ব্যাপারে ইসলামের নবী বলেছেন, "কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মোকদ্দমার ফয়সালা করা হবে, তা হবে রক্তপাত (হত্যা) সম্পর্কিত" (বোখাঈ)। কাউকে হত্যা করাকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে, শুধু নিষেধ করেই শেষ করে নাই, বরং যারা এসব সন্ত্রাসী ও জঙ্গি-কার্যক্রম করে, তাদের শাস্তি কত ভয়াবহ, সে-সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। ইসলামের শিক্ষা কত উন্নত যে, বল-প্রয়োগ করে ইসলামের প্রচার করতে পর্যন্ত বারণ করা হয়েছে।

এত উন্নত শিক্ষা ইসলামের থাকা সত্বেও আজ গুটিকতক উন্মাদ ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অভিযোগ করে যে, ইসলাম নাকি সন্ত্রাসের শিক্ষা দেয়। অথচ ইসলাম সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সব সময় সোচ্চার। যদি আমরা ইসলাম ও রাসূল করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শ পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাই, কতই না উন্নত শিক্ষা আমাদের নবী করীম (সা.)-এর। আঘাতে জর্জরিত করা হয়েছে, কিন্তু তিনি পাল্টা প্রতিশোধ না নিয়ে করেছেন ক্ষমা। দু'হাত তুলে শত্রুদের সংশোধনের জন্য দোয়া করেছেন। আমরা দেখতে পাই, কেউ কেউ এমনও আছেন, যারা হযরত রসূল করীম (সা.)-এর জিহাদের কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি ইসলামের জন্য অস্ত্র হাতে নিয়েছেন। হ্যাঁ, হযরত রসূল করীম (সা) জিহাদ করেছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি তা কেন করেছেন, তাও বুঝতে হবে। তিনি কি কোন লোভে বা রাজত্ব দখলের আশায় জিহাদ বা অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন?

একটু ভেবে দেখুন! যার জন্য এই জগৎ সৃষ্টি, যিনি সমস্ত জগতের জন্য রহমত স্বরূপ হয়ে এসেছেন, সেই মহান নবীকে মক্কা নগরীতে ক্রমাগতভাবে তেরটি বছর কিনা যুলুম অত্যাচার নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। হযরত খাতামান্ নবীঈন (সা.) তো ছিলেন ন্যায়পারায়ণ, যাঁর কোন দোষ-ত্রুটি ছিল না। আর সেই নবী (সা.)-কে কতই না অত্যাচার করা হলো, নির্দোষ সাহাবীদেরকেও তারা ছাড়লেন না। এসব নজীরবিহীন নিষ্ঠুর যুলুম, অত্যাচার থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তারা মদীনাতে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু মদীনাতেও শত্রুরা তাদেরকে স্বস্তিতে থাকতে দিল না। কাফেরদের বিরুদ্ধে যে অস্ত্র ধারণ, তা করতে মুসলমানরা সেদিন বাধ্য হয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জিহাদ ছিলো তাদের বিরুদ্ধে, যারা ধর্মকে মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল। সেদিন জিহাদের মূল-উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহ্‌ তা'লার একত্ব বা তৌহীদকে প্রতিষ্ঠা করা। মুসলমানদের অস্ত্র হাতে নেয়া কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ছিলো না মুসলমানরা কেবল আত্মরক্ষার্থেই বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হয়েছিল। মুসলমানরা নিজেদের পক্ষ থেকে কখনও প্রথমে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়নি। মুসলমানদের অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে- 'যেমন ২২নং সূরার আয়াত ৪১, ৪নং সূরা আয়াত ৭৬, ২২নং সূরার আয়াত ৪০। এসব আয়াতগুলো পাঠ করলেই বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হবে, কেন মুসলমানরা জিহাদ করেছিলেন।

আবারো বলতে চাই, হযরত রসূল করীম (সা.)-এর সময়ের জিহাদের লক্ষ্য ছিল আত্মরক্ষা করা, ইসলামকে রক্ষা করা। আর সেই জিহাদ ছিল বিবেকের স্বাধীনতা রক্ষার জিহাদ, চিন্তাচেতনা ও বুদ্ধির মুক্তি-প্রতিষ্ঠার জিহাদ। এছাড়া তখন অস্ত্র হাতে নেয়ার উদ্দেশ্য এটাও ছিলো ধর্মীয়-স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা, অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয়গুলো, যথা-মঠ, মন্দির, আশ্রম, সিন্যাগগ্, গীর্জা, প্রভৃতিকে রক্ষা করা। কোন ধর্মের উপাসনালয়কে ধ্বংস করার কোন নির্দেশ তিনি (সা.) কখনো দেন নি।

মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি কেবল তখনই দেয়া হয়েছিল, যখন বিরোধী শক্তি তাদের ওপরে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল। আর এ-যুদ্ধ সে-সময় পর্যন্ত চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে। যে পর্যন্ত না ধর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মীয়-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলেই যুদ্ধ থামিয়ে দিতে বলা হয়েছে, এ জন্যই হযরত রসূল করীম (সা.) অনেকগুলো সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। যদি খোদাতায়ালার নির্দেশ এমন হতো যে, অবিশ্বাসীরা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, তা-হলে নবী করিম (সা.) কখনই ঐসব সন্ধি স্থাপন করতেন না।

ইসলাম কখনো তরবারির জোরে বিস্তার লাভ করেনি। তরবারির জোরে সন্ত্রাসী রাজত্ব কায়েম হতে পারে, শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। হযরত রসূল করীম (সা.) তরবারী দিয়ে মানব হৃদয়ের পাপ কালীমা সাফ করেছেন। তরবারির মাধ্যমে তিনি একজনকেও ইসলামের ছায়াতলে আনেন নাই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অমুসলমানেরা তরবারির ভয়ে সেদিন কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি, বরং শ্রেষ্ঠ-নবীর উন্নত-আদর্শের ফলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। হায়! আজকের বিধর্মীরা যদি শান্তির-ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নিত, তাহলে কতই না ভাল হত।

(চলবে)

masumon83@yahoo.com

মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পড়ার ফযিলত

এনামুল হক রনি

আমাদের নেতা ও প্রভু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। তাঁকে সৃষ্টি না করলে এ জগত অপূর্ণ থাকতো। তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এ জগত হয়েছে পূর্ণ ও ধন্য। তিনি রসূলে খাতামান নবীঈন আহম্মদে মুস্তফা ও মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

পবিত্র কুরআন মজীদে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম', অর্থাৎ-নিশ্চয় তুমি অতীব মহান-চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত, (সূরা মূলক: ৫)। এ কারণে মহান আল্লাহ্ পাক স্বয়ং তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের) প্রশংসার কথা পবিত্র কুরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন 'ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়িকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান-নাবিয়্যে, ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা', অর্থাৎ-নিশ্চয় আল্লাহ্ এই নবীর উপরে রহমত নাযেল করেছেন এবং তাঁর ফেরেশ্‌তাগণও তাঁর জন্য রহমত প্রার্থনা করছে। হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরাও তার জন্য রহমত প্রার্থনা কর এবং পরিপূর্ণ শান্তি কামনা কর। (সূরা আহযাব : ৫৭)।

উপরে উল্লেখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তাঁর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের) উপর দরূদ প্রেরণ করছেন এবং তাঁর সাথে ফিরিশ্‌তাগণও দরূদ প্রেরণ করছেন। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই যারা মু'মিন, তাদের উচিত হবে, অগনিতভাবে দরূদ পাঠ করা। কারণ, দরূদ পাঠে নিজেরাই ধন্য হবে।

আমাদের প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তির সামনে আমার নাম আলোচিত হয়েছে আর সে আমার উপর দরূদ পড়েনি সেই হচ্ছে কৃপণ (তিরমিযী)। এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, একমাত্র কৃপণরাই রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের) প্রতি দরূদ প্রেরণ করে না। তাই আমরা যেন কেউ কৃপণ না হই, বরং দরূদ পাঠ করি।

দরূদ পাঠের ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্ এর বিনিময়ে তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করেন (মুসলিম শরীফ)। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে, যে আমার ওপর সবচেয়ে বেশী দরূদ পাঠ করে (ইমাম তিরমিযী)।

দরূদ পাঠ করা আমাদের জন্য কত বেশী জরুরী তা আমরা উপরোক্ত হাদীস থেকে উপলব্ধি করতে পারি। একবার হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযে দোয়া করতে দেখে বললেন: এই ব্যক্তি তাড়াহুড়া করেছে; তারপর তাকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন: যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে, পাক-পবিত্র প্রভূর হামদ ও সানা দিয়েই শুরু করা উচিত, এরপর নবীর ওপর দরূদ পাঠ করা উচিত, এরপর নিজ ইচ্ছামত দোওয়া করা উচিত (ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযী)। এ হাদীসে নামাযের দোয়াতেও দরূদ শরীফ পাঠ করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

তাই আমাদের উচিত অনেক বেশী বেশী দরূদ পাঠ করা। একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, 'আবু মুহাম্মদ কা'ব ইবনে উজরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একদিন আমাদের কাছে এলেন। আমরা তাঁকে বললাম : হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার ওপর সালাম কিভাবে পাঠাতে হবে? তিনি বললেন, 'বলো : **আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা-আলে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম্মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা-আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম্ মাজীদ।"**

অর্থাৎ-হে আল্লাহ্! রহম করো মুহাম্মদের উপর এবং মুহাম্মদের পরিবার বর্গের ওপর, যেমন রহম তুমি করেছিলে ইব্রাহীমের পরিবার-বর্গের ওপর, নি:সন্দেহে তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত (ইমাম বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)।

উক্ত হাদীসে দরূদ শরীফ পাঠের পদ্ধতি শেখানো হয়েছে। আমরা এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করতে পারি। এ যুগে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক তাঁরই দাস হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ আলাইহে ওয়া সাল্লাম দরূদ পাঠ বিষয়ে লিখেছেন: 'দরূদ শরীফের তোফায়েল বা মধ্যস্থতা'..... আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ্ তাআলার আশিস ও কল্যাণরাজি আশ্চর্য-আলোর আকারে হযরত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দিকে ধাবিত হচ্ছে, এবং সেখানে গিয়ে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সিনার ভেতর বিশোষিত হয়ে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে আবার বের হয়ে অসংখ্য ধারায় প্রবাহিত হয়ে প্রত্যেক হকদার বা প্রাপকের কাছে তার ধারণ-ক্ষমতার অনুপাতে পৌঁছে যাচ্ছে। এটা নিশ্চিত যে, কোন প্রকার অনুগ্রহ বা কল্যাণই হযরত্ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাধ্যম-ব্যতিরেকে কারো কাছেই পৌঁছতে পারে না। দরূদ শরীফ কী জিনিস?

এতো সেই প্রার্থনা, যা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খাতিরে আল্লাহ্‌র সেই আরশের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে, যেখান থেকে আলোকের ধারা সমূহ উৎসারিত হয়। যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার আশিস ও অনুগ্রহ, ফয়েজ ও ফজল লাভ করতে চায়, তার অবশ্যই উচিত, সে যেন প্রচুর পরিমাণ দরূদ পাঠ করে, যাতে করে সেই আশিস ও অনুগ্রহের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়।' (আল-হাকাম-২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজে দরূদ শরীফ পাঠের এক অভিজ্ঞতা বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: 'একরাতে এ বেচারা এতো অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করেছিল যে, এতে মন ও প্রাণ সুঘ্রাণে ঘ্রাণময় হয়ে উঠেছিল। ঐ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, ফেরেশ্‌তারা স্বচ্ছ-পানির ন্যায় আলো ভর্তি মশক (চামড়ার তৈরী পানি রাখার বৃহৎ ব্যাগ) বহন করে করে আমার গৃহে প্রবেশ করছে এবং তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, এ হচ্ছে সেই সমস্ত আশিস ও কল্যাণরাজি, যা তুমি প্রেরণ করেছিলে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি (বরাহীনে আহমদীয়া পৃ: ৫৭৬)।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে আমরা দরূদ শরীফের ফজিলত জানতে পারি, তাই আমাদের অনেক বেশী দরূদ পাঠ করা উচিত। সাম্প্রতিককালে আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) আমাদেরকে বেশী বেশী দরূদ পাঠ করার কথা বলেছেন। একই সাথে আমাদেরকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসরণে চলার তাগিদ দিয়েছেন। অপরদিকে শতবার্ষিকী বাংলাদেশ জুবিলী পালন উপলক্ষেও হুযূর (আই.) আহমদীদেরকে বেশী বেশী দরূদ শরীফ পাঠ করতে বলেছেন। অতএব, আমাদের উচিত, আমরা যেন অনেক বেশী রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ প্রেরণ করি।

ইয়া রাব্বি সাল্লি আলা কাদায়েমান
ফি হাজেহিদ্দুনিয়া ওয়া বা'সেন সানী।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মরণিকার জন্য লেখার আহবান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি উদযাপনের অংশ হিসেবে প্রকাশিতব্য স্মরণিকায় প্রকাশের জন্য জামা'তের সকল ভাই-বোনের কাছ থেকে লেখা আহবান করা যাচ্ছে।

বিষয়সমূহ:

ক) **তবলীগের ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা**
খ) **ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী**
গ) **আল্লাহ্ ও রসুল (সা.)-এর শান**
ঘ) **আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে যে ত্যাগ বা মূল্য দিতে হয়েছে**
ঙ) **দোয়া কবুলিয়তের ঘটনা**
চ) **জামা'তের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য কিংবা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা** ইত্যাদি

লেখার নিয়মাবলী: লেখাটি হতে হবে তথ্যবহুল ও প্রাঞ্জল। লেখা যেন খুব দীর্ঘ না হয়। লেখাটি অবশ্যই কম্পোজ করে ও বিষয়বস্তুর সাথে কোন ছবি থাকলে ছবির স্ক্যানসহ CD তৈরী করে ডাকযোগে পাঠাতে হবে। অথবা E-mail-এ Soft কপি পাঠানো যাবে। লেখার বিষয়সমূহ ও ঘটনাবলী অতিরঞ্জন মুক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ-সঠিক হতে হবে। স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সত্যায়নকৃত থাকতে হবে। অনির্বাচিত লেখার কোন অনুলিপি ফেরত দেওয়া হবে না। লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত।

লেখা অবশ্যই আগামী ১৫ নভেম্বর ২০১২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অথবা E-mail address-**এ লেখকের ছবি ও পরিচিতি সহ পৌঁছাতে হবে:**

প্রযত্নে: মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম মিঠু
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
ও সদস্য সচিব, শতবার্ষিকী জুবিলী প্রকাশনা সাব-কমিটি
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

E-mail: amjb100@gmail.com

ঈদুল আযহা ও কুরবানী

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

১০ই যিলহজ্জ মুসলমান উম্মার জন্য অপর একটি আনন্দের দিন, যাকে ঈদুল আযহা বলা হয়। এ ঈদেও অনেক ফযিলত রয়েছে। ঈদের নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। ঈদ আসে বিশ্ব মুসলিমের দ্বার প্রান্তে বাৎসরিক আনন্দের বার্তা নিয়ে, আসে সীমাহীন প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও কল্যাণের সওগাত নিয়ে। তাই ঈদকে যথার্থ মর্যাদায় উদযাপন করা এবং ঈদের নামায আদায় করা প্রত্যেক মু'মিন-মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।

ঈদুল আযহা শব্দদ্বয় আরবী। মুসলমানগণ পরম ত্যাগের নিদর্শন স্বরূপ যিলহজ্জ মাসের ঐতিহাসিক দশ তারিখ পশু যবেহর মাধ্যমে কুরবানীর যে আনন্দ-উৎসব পালন করে থাকেন, তা-ই ঈদুল আযহা। ঈদের দিনে সকল হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে পরস্পর প্রীতির ডোরে আবদ্ধ হয়ে ঈদের আনন্দের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার অবশ্য কর্তব্য। কুরবানীকে আরবী ভাষায় উযহিয়্যা বলা হয়। 'উযহিয়্যা' শব্দের আভিধানিক অর্থ-হল, ঐ পশু, যা কুরবানীর দিন যবেহ করা হয়। আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে পশু যবেহ করাকে কুরবানী বলা হয়।

কুরবানীর তাৎপর্য হলো, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও প্রিয়-বস্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করা। প্রশ্ন আসতে পারে, পশু কুরবানী কেন? মূলত প্রচলিত কুরবানী হযরত ইবরাহীম (আ.) এর অপূর্ব আত্মত্যাগের ঘটনারই স্মৃতি বহন করে। এ ঐতিহাসিক-ঘটনার কথা পবিত্র কুরআনের সূরা আস্ সাফফাতে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উক্ত সূরার ১০১ নং আয়াত হতে ১০৮ নং আয়াত পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনা হলো :–

১০১। (সে বললো) 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৎকর্মশীল উত্তরাধিকারী দান কর।

১০২। তখন আমরা তাকে এক পরম সহিষ্ণু-পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

১০৩। এরপর সে যখন তার সাথে দৌড়াদৌড়ি করার বয়সে পৌঁছলো সে বললো, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখে থাকি, আমি তোমাকে যবাই করছি। অতএব, চিন্তা কর (এ ব্যাপারে) তোমার অভিমত কি? সে বললো, 'হে আমার পিতা! তোমাকে যে আদেশ দেয়া হচ্ছে, তুমি তা-ই কর। আল্লাহ্ চাইলে তুমি অবশ্যই আমাকে ধৈর্যশীল দেখতে পাবে।

১০৪। এরপর তারা উভয়ে যখন (আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সামনে) আত্মসমর্পণ করলো এবং সে (অর্থাৎ ইবরাহীম) তাকে (মাটিতে) উপুড় করে শোয়ালো,

১০৫। তখন আমরা তাকে ডাক দিলাম, 'হে ইবরাহীম!

১০৬। তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করেছ! নিশ্চয় আমরা এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

১০৭। নিশ্চয় এ ছিল এক সুস্পষ্ট-পরীক্ষা।

১০৮। আর আমরা এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে তাকে বাঁচালাম।

উপরোক্ত আয়াতের আলোকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা ইবরাহীম (আ.)কে তাঁর সর্বপেক্ষা প্রিয়-পাত্র, একমাত্র-পুত্র ইসমাঈলকেই (আ.) কুরবানী করার আদেশ দিয়েছিলেন। ইবরাহীম (আ.)কে তাঁর স্বপ্ন-দৃষ্ট কুরবানী একেবারে আক্ষরিক ভাবে পালন করতে হয়নি। যদিও তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.) আক্ষরিকভাবে তা পালন করতেই প্রস্তুত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, স্বপ্নদৃষ্ট-কুরবানী তখনই এক হিসাবে পূর্ণ হয়েছিল, যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) স্ত্রী হাজেরা ও শিশু-পুত্র ইসমাঈলকে মক্কার ধু-ধু উপত্যকায় আশ্রয়হীন অবস্থায় ছেড়ে গিয়েছিলেন। এই যে বীরত্বের কার্য, এরই মাঝে হযরত ইসমাঈলের কুরবানীর চিহ্ন ও প্রতীক রয়েছে। ইসমাঈল (আ.)কে কুরবানী দেয়ার ব্যাপারে ইবরাহীম (আ.) এর অবিচল-নিষ্ঠা ও পুত্র ইসমাঈলের অটল-সংকল্প ও প্রস্তুতি মানব-ইতিহাসে চির-স্মরণীয় করার জন্য হজ্জব্রত পালনের অঙ্গ হিসেবে পশু কুরবানী করাকে একটি ইসলামী অনুষ্ঠানরূপ দেয়া হয়েছে। আরো বুঝা যায় যে, ইবরাহীম (আ.) এর সময় নরবলী দেয়ার যে প্রচলন ছিল, তা পশু কুরবানীতে বদলে দেয়া হলো।

পশু কুরবানীর মাধ্যমে হজ্জযাত্রীগণ স্মরণ করেন হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) এর কুরবানীর কথা, তাঁদের নজিরবিহীন-ত্যাগ এবং তিতিক্ষার কথা। রূপকভাবে এর মাঝে এ-শিক্ষা নিহিত রয়েছে যে, মানুষ যেন শুধু নিজেকে কুরবানী করার জন্যই সর্বদা প্রস্তুত না রাখে, উপরন্তু তাকে তার ধন-সম্পদ, এমন কি সন্তান-সন্ততিকেও আল্লাহ্‌র পথে, একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য, কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

ঈদুল আযহার কুরবানীর নিয়ম বলতে গিয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন, "আঁ-হযরত (সা.) এর সঙ্গে আমি ঈদুল আযহার নামায পড়লাম। অত:পর হুযূর (সা.) এর নিকট মেষ আনা হল। তিনি (সা.) একে যবাই করলেন। যবাই করার সময় তিনি বলেছিলেন, "বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবর" আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়। হে আমার আল্লাহ্! এই কুরবানী আমার তরফ হতে এবং উম্মতের সে সকল লোকের তরফ

হতে কবুল করুন, যারা কুরবানী করতে পারে না।" (তিরমিযী)।

আসলে কুরবানীর জন্য নিয়তটাই আসল। কুরবানী যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হয়, তাহলেই তা কবুল করা হবে। কে কত দামী, কত বড়, কত সুন্দর গরু, ছাগল, ইত্যাদি কুরবানী করলো, সেটা বিবেচ্য নয়। কেননা, কুরবানীকৃত পশুর গোশ্‌ত ও তাদের রক্ত কখনও আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, বরং তাঁর নিকট তোমাদের তরফ হতে তাক্‌ওয়া পৌঁছে। সুতরাং আমাদের মাঝে যাদের সামর্থ্য আছে তারা যেন তাক্‌ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কুরবানী করে।

হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থ্যবান থাকা সত্বেও কুরবানী না দিবে, তারা-যেন ঈদের জামাতে না আসে।

অতএব, যারা কুরবানী দিবেন, তারা অবশ্যই গরীব, মিসকিন, আত্মীয় স্বজনদের যে হক্‌, তা পুরোপুরি আদায় করবেন। এ ব্যাপারে জামাতের পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা দেওয়া আছে। সবশেষে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) এর একটি উদ্ধৃতি পেশ করেই লেখার ইতি টানছি। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেছেন, "দ্বিতীয় প্রাসঙ্গিক-বিষয় হচ্ছে, এই মাস ত্যাগের মাস বলে পরিচিত। হযরত রাসূল করীম (সা.) ত্যাগের উত্তম উদাহরণ দানের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। যেমন, তোমরা ছাগল, গরু ও উট এবং ভেড়া কুরবানী দিয়ে থাক, তদ্রুপ আজ হতে তেরশত বছর পূর্বে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পথে মানুষ নিজেদের জীবন কুরবানী করে দিত। সেটাই ছিল প্রকৃত বড়-ঈদ এবং ওটাই ছিল প্রকৃত সময়, যখন জগৎকে প্রভাতের আলো প্রদর্শন করা হয়েছিল।

বর্তমানে পশু যবাই করার মাধ্যমে যে-ভাবে মানুষ কুরবানী করে, তা কুরবানীর শাঁস নয়, কুরবানীর খোলাস মাত্র। তা আত্মা নয়, দেহ মাত্র। (মলফুযাত, ২য় খন্ড)। মহান আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদেরকে প্রকৃত-অর্থে ঈদ উদযাপন ও কুরবানী করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

ইসলাম-ই আমাদের ধর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন:

"আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌**। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হচ্ছে, আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন **'খাতামান্‌ নবীঈন'** ও **'খায়রুল মুরসালীন'** যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্‌ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।"

[ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]

আমি কেন আহমদী!

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

আমি আমার খোদার অস্তিত্বকে খুঁজি, আমি আমার জন্য মনোনীত ধর্মকে খুঁজি, আমি সত্যকে খুঁজি, সৎদেরকে খুঁজি, আমি পুণ্যকে খুঁজি, স্বর্গকে খুঁজি, আমি আমার নিজের মাঝে নিজেকে খুঁজি, আমার আত্মার খাদ্য খুঁজি, খোদা-প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ রাসূলকে খুঁজি, মানুষে মানুষে বিভেদ নয়, সহমর্মিতায়, অভেদে থাকার উপায়কে খুঁজি, আমি বিশ্বের সর্বত্র শান্তি ও সৌহার্দ্রের বন্ধন সৃষ্টির পথ খুঁজি, ধর্মে ধর্মে দ্বন্দ্বের অবসানের উপায় খুঁজি, আমি বিবিধ ধর্ম-বিশ্বাসীদের মাঝে প্রতিহিংসার রক্ত ঝরানো যুদ্ধ নিরসন হওয়ার পথ খুঁজি, আমি বিশ্ব-মানবের জন্য একই রাসূল ও একই ঐশী বাণীর সন্ধান করি, আমি আমার আত্মার জন্য জ্যোতি খুঁজি, জান্নাতের আসন খুঁজি, জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির পথ খুঁজি, আমি খোদার রাজ্যে খোদার শাসন প্রতিষ্ঠার শক্তি খুঁজি, আমি স্বর্গ হতে আমাকে ডাকার আহ্বান খুঁজি, মর্ত্যের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকার সাহায্য খুঁজি, আমি স্রষ্টার সাথে তাঁর শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টির সম্পর্ক গড়ার পথ খুঁজি, আমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-স্বর্গীয় অপরূপ-সুন্দর এ সত্য-বাণীকে বিশ্বময় বিজয়ের কাজে আমাকে সাহায্যের জন্য আমার সহযোগীকে খুঁজি, আমি ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসে বিশ্বাসীদেরকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করার লড়াইয়ের কাজে সহযোদ্ধাদের খুঁজি, শাসন দন্ড হাতে নয় বরং দোয়ার জোরেই সত্য-ধর্মের বিজয় অর্জন সম্ভব, আমি এমন মনস্কামী সুজনদের খুঁজি। ইহা ধ্রুব সত্য যে, আমার হৃদয়ের এসব সাধ, ইচ্ছা ও কামনা-বাসনা জগতে বসবাসরত ঐশী-সম্পর্কহীন লোকদের দ্বারা ফলপ্রসূ হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। এরজন্য প্রয়োজন, স্বর্গ-স্বীকৃত পবিত্রাত্মাগণ কর্তৃক গঠিত পবিত্র সিলসিলা। আহমদীয়াতের মাঝে আমি সেই পবিত্রতার সন্ধান পেয়েছি, তাই আমি আহমদী।

আমি আদৌ বিশ্বাস করতে পারি না যে, মর্তবাসী কোন মানুষ জাগতিক দেহ নিয়ে সুদীর্ঘ সময় আকাশে জীবিত থাকতে পারে। আমি এ অবমাননা কোন ভাবেই স্বীকার করতে পারি না যে, বিশ্ব মানবের পরিত্রাণ প্রয়াসে আগত শ্রেষ্ঠ-মানব নবীয়ে আলা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃত্যু বরণ করেছেন, আর কিনা ছোট এক জাতির হেদায়াতের জন্য আগত নবী শত সহস্র বছর যাবত আকাশে জীবিত থাকবেন? আমি কুরআনের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার পরিপন্থী এমন কোন অযৌক্তিক শিক্ষাকে কোনভাবেই আমলে নিতে পারি না। আমি ধর্মমত প্রচারের স্বার্থে বোমাবাজী, মারণাস্ত্রের দ্বারা মানব জীবন সংহার করে স্বধর্ম রক্ষা ও প্রচার প্রথাকে আমি কোনভাবেই স্বীকার করে নিতে পারি না।

এসব কেবল আরবী নবী (সা.)-এর শিক্ষারই বৈরী কাজ নয়, বরং ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবী পয়গম্বরগণের শিক্ষারও পরিপন্থী কাজ। কাজেই, পুণ্য-শূন্য এমন হীন-কর্ম সাধনকারী দলের সাথে আমি মোটেই সম্পৃক্ত থাকতে পারি না। আমি আমার খোদার নির্ধারিত পথে এবং তাঁর নির্দেশিত মতে ধর্মকর্ম পালন করতে চাই, কিন্তু অস্ত্রের ভয়ে নয়। অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে অন্যকে কলেমা পড়ানো ও সালাম প্রদান থেকে বিরত রাখা, বলপূর্বক মসজিদ দখল করে তার গায়ের কলেমা মোচন করা, অন্যদের ইবাদতখানা, মসজিদ মন্দির ও গীর্জা, প্যাগোডা, দখল করে তাতে অস্ত্রের আঘাতে রক্ত ঝরানোর মত জঘন্য অপকর্মকে আমি নিকৃষ্টভাবে নিন্দা করি।

আমি আনত অনুরাগে বিশ্বাস করি যে, "লা ইক্‌রাহা ফিদ্দীন"–ধর্মে কোন বল-প্রয়োগ নেই। "লাকুম দ্বীনকুম ওয়ালিয়া দ্বীন", 'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন'–আমি ইসলামের অসম্ভব সুন্দর এ নীতিতে অনড়, অটল-বিশ্বাসী। আমি হন্নে হয়ে খুঁজেছি, জগতময় পাগলপারা ছুটেছি, কিন্তু কোথাও আমি এ-নীতির উপর একনিষ্ঠ-বিশ্বাস স্থাপনকারী কাউকেই পাইনি। অবশেষে আমি নেযামে আহমদীয়াকেই এর প্রত্যেকটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে জেনেছি। আমি দেখেছি, পৃথিবীতে কেবল এ জামাতই ধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নীতি ও খোদার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে ধর্ম-বিস্তারের পক্ষে কর্ম করে যাচ্ছে। এজন্যই আমি আহমদীয়াতের একজন অনুরক্ত অনুসারী এবং এজন্যই আমি আহমদী।

এক জাতি অন্য জাতিকে কুর্নিশ করে চলবে, মানুষের কাছে মানুষ জিম্মি হয়ে থাকবে, ক্ষমতার চক্রবালে মানবতা সর্বত্র পদদলিত হবে, ধনাঢ্যের ক্ষমতায় দরিদ্র্য নিষ্পেষিত হবে, দেশের কর্ণধারগণ তাদের প্রতিহিংসার প্রতিযোগিতা চরিতার্থ করবে, আর সে মতানৈক্যের লড়াইয়ের দাবদাহে দেশের সাধারণ মানুষ দগ্ধ হয়ে মরবে, আমি এমন অপকর্মের চরম-বিরোধী।

বর্তমানে পৃথিবীতে মাত্র একটি জামাতই আছে, যারা মানুষের এহেন দুর্দশা ও দুঃশাসন দূর করার প্রয়াসে দুর্বার গতিতে কাজ করে যাচ্ছে। তারা ঐশী শিক্ষার আলোকে পৃথিবীতে পুনরায় মানবতার সর্বোত্তম-আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। সেই মহান জামাতের নামই হলো আহমদীয়া জামাত। আমি এ জামাতকে দেখেছি, তাদের সাথে একান্তে মিশেছি, তাদেরকে জেনেছি। কিন্তু তাদের সাধনা ও সাধ্যে, কথা ও কাজের মধ্যে কখনো কোন ফরাগ কিংবা কখনো কোন

কৃত্রিমতা দেখিনি। তাদের পরস্পরের কাজের মধ্যে কোন খাদ নেই, ক্ষোভ নেই, শঠতা কিংবা খুঁত নেই। আমি সেখানে সব সত্যের মূল দেখেছি। সেখানে আমি স্বর্গ-প্রদত্ত সত্য- মানুষের আহ্বান শুনেছি। আমি সেখানে আমার আত্মার সকল চাহিদার অবিকল খোরাক পেয়েছি। এজন্যই আমি আহমদীয়াতের একনিষ্ঠ অনুসারী। এজন্যই আমি আহমদী।

মানুষ দুর্নিবার ভাবে দুর্নীতি করবে, বেপরোয়া দুষ্কর্ম চালাবে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে রক্তের স্রোত বহাবে, বেদম উৎকোচ গ্রহণ করবে, পেশা হিসেবে জুয়া খেলবে, নারীদের শ্লীলতাহানী করবে, পরার্থ হরণ করবে, মদ জলবৎ পান করবে, ধর্ম রক্ষার নামে ধর্মের ব্যবসা করবে, চাকচিক্যপূর্ণ মসজিদ হবে বটে, কিন্তু তাতে প্রকৃত-ইবাদতকারী থাকবে না, দ্রব্য-পণ্যে ভেজাল দিবে, কথা ও কাজে জাল-জালিয়াতি করবে, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অকপটে অনর্গল মিথ্যা বলবে, চরিত্রহীনতা বে-ধড়ক প্রসার লাভ করবে, শতভাগ বিশ্বাস-যোগ্যতা লোপ পাবে, শঠতা, হঠকারিতা ও প্রবঞ্চনার প্রাবল্য হবে।

এমনি ধরণের শত-হাজার দুরাচার-দুষ্কর্মের আক্রমণ মানবচরিত্রকে ভয়ংকরভাবে সর্বনাশ করবে, অথচ সেই পরিস্থিতিতে চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করার নিমিত্তে কোনভাবেই দেবদত্ত কোন প্রতিনিধির আগমন হবে না, ঐশী ওহী-ইলহামও হবে না, পরন্তু ওহী-ইলহামের দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে, তা কী করে সম্ভব? কত কষ্টে স্বীয় আত্মাকে শান্তনা দিব যে, 'হ্যা, এ তথ্যই সত্য'? কিন্তু সিলসিলা আহমদীয়া এ ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক-বিশ্বাসে মোটেই বিশ্বাসী নয়। তারা কোনভাবেই কুরআনের বিপক্ষে, স্বর্গীয় সত্যের বিপরীতে কোন তথ্যকেই সত্য বলে স্বীকার করে না। তাদের যুক্তি হলো, "কসম মহাকালের, নিশ্চয় মানুষ বড় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, তবে তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং তারা একে অপরকে সত্যের তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে....."(১০৩ : ২-৪)। অর্থাৎ, কালের আবর্তে মানুষের পদস্খলন হবেই। ইহা খোদার সৃষ্টি-জগতের কৃষ্টি। তবে তা খোদার অনুকম্পায় তাঁর প্রতিনিধি এসে অবশ্যই দূর করার প্রয়াস নিবেন। ইহাই আসল কথা। মানুষ খারাপ হওয়ার যেমন সম্ভাবনা আছে, তেমনিভাবে তাকে সুপথ দেখিয়ে সুজন করারও ব্যবস্থা আছে। যদি তা না-ই থাকে, তবে তাঁর রাহমান ও রাহিম নামের সার্থকতা কোথায়? এ তথ্যমূলে যিন্দা-ধর্ম ইসলামে অবশ্যই উম্মতী-নবীর আগমন হবে। আর এজন্যই ইসলাম শ্রেষ্ঠ-ধর্ম এবং এজন্যই তার নবী আওউয়াল ও আখেরি নবী। আমি আহমদীয়াতের বিজ্ঞান- ভিত্তিক ও যুক্তি-সমৃদ্ধ এ উক্তির সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত এবং এ-যুক্তিই প্রকৃষ্ট সত্য বলে আমার বিদ্যা ও বিবেক নির্দ্বিধায় সায় দেয়। তাই আমি আহমদীয়া মতাদর্শে আন্তরিকতার সাতে প্রত্যয় রাখি, আর এজন্যই আমি আহমদী।

আমি অবশ্যই জ্ঞাত যে, মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন, "হে আদম সন্তানগণ! যখন তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতে রাসূলগণ এসে তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনায়, তখন যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করবে এবং সংশোধন করবে, সেক্ষেত্রে তাদের জন্য না কোন ভয় থাকবে এবং না তারা দুঃখিত হবে" (৭ : ৩৬)। এ ঘোষণামূলে আহমদীয়া জামাতের সদস্যগণ তাদের হৃদয়পটে ধ্রুব প্রত্যয় রাখে যে, ইসলামে তার অনুসারীদের মধ্যে রাসূলগণ এসে থাকবেন। তখন যারা তাঁকে গ্রহণ করবে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না, আর তারা দুঃখিতও হবে না। প্রত্যাদিষ্ট এসব রাসূল এ অবস্থায়ই আসবেন, যখন পৃথিবীর মানুষের প্রায় অধিকাংশজনই সর্বৈবভাবে ঈমান আমল-শূন্য হয়ে পড়বে।

বর্তমান যুগের মানুষ এমতাবস্থাতেই নিপতিত। সেই সুবাদেই যুগের ইমাম ইলাহী-প্রতিনিধি দুনিয়ায় আগমন করেছেন। আহমদীয়া জামাত তাঁর সন্ধান নিয়ে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে খোদা তাআলার অভিলাষ বাস্তবায়নে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর এ স্বর্গীয়-আওয়াজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার কাজে জীবন-প্রাণ বিনিয়োগে প্রচন্ডভাবে চেষ্টা করছে। আমি এহেন নেক ও পুণ্য-বিজড়িত কাজ থেকে কোনভাবেই নিজেকে বঞ্চিত রাখতে পারি না। আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন থেকে দূরে সরে থাকতে পারি না, এজন্যই আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি, আর এজন্যই আমি আহমদী।

হে আহমদীয়াতের বিরুদ্ধবাদী মানব মন্ডলী! আপনারা আমাদের অপচিকীর্ষা করার চেষ্টা করবেন না। ইহা অবশ্যই, খোদা বিরোধী কাজ। একাজে মোটেই ত্বরা করবেন না। আমাদেরকে অমুসলমান বলার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবেন না। আমাদেরকে কাফের বলার দুঃসাহস পোষণ করবেন না। আমাদের কণ্ঠে কলেমা উচ্চরণের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না। স্মরণ রাখবেন, এর প্রত্যেকটাই অপকর্ম, এর প্রত্যেকটাই ঐশী-সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কাজ। আহমদীয়াত এমন কোন প্রতিষ্ঠানের নাম নয়, যা কিনা মানুষের দুশমনি-প্রয়াসে নিঃশেষ হয়ে যাবে, দুর্মুখের দুর্বচনের কারণে কলংকিত হবে। আহমদীয়াত আর্শি-তুল্য স্বচ্ছ, সূর্য-সদৃশ জ্যোতিষ্ক, প্রলয়-সদৃশ শক্তিমান, খোদার হস্ত-তালুতে তার অবস্থান। সুতরাং একে কোনভাবেই এতটা দুর্বল, নাজুক ও নড়বড়ে মনে করবেন না। ইহা স্বয়ং খোদা-প্রদত্ত প্রতিনিধি হযরত মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আ.) কর্তৃক রোপিত স্বর্গীয়-জ্যোতিঃ সমৃদ্ধ বৃক্ষ। শনৈঃ শনৈঃ এ বৃক্ষ বৃদ্ধি লাভ করবে, ফুলে ফলে সুশোভিত হবে। নচ্ছার দুর্বৃত্ত দুরাচারগণও এর ফল আহারে সুজন, সুমহান চরিত্রের অধিকারী হবে। বিশ্বের প্রত্যেক ধর্মের প্রত্যেকে এসে এর ছায়াতলে একত্রিত হবে, আত্মার খোরাক নিবে, পৃথিবীতেই তারা জান্নাতের স্বাদ অনুভব করবে। সুতরাং, এই বৃক্ষকে কর্তনের চেষ্টা করবেন না। বরং যে তা করার দুঃসাহস পোষণ করবে, সে নিজেই কর্তিত হয়ে যাবে, যে তাকে ধ্বংস করতে প্রয়াস নিবে, সে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। যে তাঁকে কলংকিত করার চেষ্টা করবে, সে নিজেই কলংকিত হবে। সুতরাং, এ-ব্যাপারে খুব ধীরে চলুন এবং অন্তর্লোক ও বিবেক-বিবেচনা খাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিন, যেন সর্বনাশা গহ্বরে নিপতিত না হন।

জেনে রাখুন, আহমদীয়াত ঐশী-জগতের এক অনন্য সাধারণ পরিকল্পনা। স্বয়ং স্বর্গের ফেরেশ্তাকুল এর নিগরানী করছে। আহমদীয়াত নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার জন্য আসেনি, বরং অশেষ হয়ে থাকবে। আহমদীয়াত বিশ্ব বিজয়ের পরিকল্পনা নিয়ে আসছে। বিশ্বের তাবৎ অনিয়ম, অরাজকতা, দুর্নীতি, দূরবস্থা দূর করতঃ এ জামাত পৃথিবীকে মহাশান্তির আবাসন বানাবে। আপনি বরং আপনার হৃদয় ক্রোধকে প্রশমিত করে এ জামাতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করুন এবং তার সাহায্যকারী হউন। ইহাই হবে আপনার জন্য মহাকল্যাণকর কাজ।

পৃথিবী এখন মানুষ নামের অমানুষদের অপকর্মের ফলে প্রজ্জ্বলিত আগুনে জ্বলছে। সে শান্তির প্রত্যাশায় আহাজারী করছে। তাকে শান্তনা দেয়ার কেউ নেই। তার এ দুর্দিনে তার পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। জাগতিক-সম্পদ, সম্মানে সমৃদ্ধ হওয়ার কামনায় প্রচন্ডভাবে ব্যস্ত এ মানুষ দ্বারা অদ্য এ পৃথিবীকে শান্তি সুখের আবাসন বানানো আদৌ সম্ভব নয়। এরজন্য প্রয়োজন ঐশী ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা। পৃথিবীতে বর্তমানে আহমদীয়া জামাতই কেবল সত্যের দাবীদার, যে, তারা খোদার ব্যবস্থাপনার অধীন কাজ করে যাচ্ছে। এজন্যই আমি খোদার পথ অনুসারী এ দলের একজন সদস্য এবং এজন্যই আমি আহমদী। আমি সকাতরে, সবিনয়ে সবার সকাশে অনুরোধ করছি যে, হে বন্ধুগণ! যারা আত্মার মঙ্গল চান, তারা আসুন, সত্যকে পরখ করুন। খোদা তাআলার পরিকল্পিত কর্মকে সহায়তা করে জন্মোদ্দেশ্যকে সার্থক করুন।

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র-প্রতিষ্ঠাতা ধর্মের বিশ্ব-নেতা মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেছেন, 'হে লোক সকল! তোমরা কেন সেই প্রেমাধারের সহিত হৃদয় বাঁধ না, যাহার ভালবাসা তোমাকে ভারী শৃঙ্খল হইতে মুক্ত রাখবে? হে অর্বাচীন! যাও, পরিণামের চিন্তা কর, সাদীর কথাই শুন, যদি আমার কথা না-ই শুন, তিনি বলেন, 'তোমার মৃত্যুর দিন তোমার পরিণয়ের দিবস হইবে, যদি পুণ্য ও নেকীর সাথে তোমার পরিণাম হয়।'

একথা অবিসংবাদিত সত্য যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও কেউ এ নেকি ও পুণ্য খুঁজে পাবে না।

ঈদুল আযহার দিনে তক্‌বীর পাঠ

৯ই যিলহজ্জের ফজরের নামাযের পর থেকে ১৩ই যিলহজ্জের আসরের প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে উচ্চস্বরে এ তক্‌বীর পাঠ করতে হয়।

"আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার
আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।"

অর্থঃ আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই। আর আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই।

ঈদের নামাযে যাওয়া-আসার সময় এ তক্‌বীর বেশি বেশি পাঠ করা কর্তব্য।
(সূত্রঃ ফিকাহ্‌ আহমদীয়া, ১৭৯ পৃষ্ঠা)

ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাচ্ছি আন্তরিক ঈদের শুভেচ্ছা ও ঈদ মোবারক।
-সম্পাদক

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে

আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহ্‌মদী'র 'নবীনদের পাতা'র পাশাপাশি প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**। এবারের পাঠক কলামের বিষয় **"হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় জীবনাদর্শ"**।

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

লেখা পাঠানোর আগে মনে রাখবেন- লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে। লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ নভেম্বর, ২০১২-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-
সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১,
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

বাংলার কিংবদন্তি

জার্মানীর প্রথম মিশনারী
খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(শেষ কিস্তি)

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী, জার্মানীর প্রথম মিশনারী। জন্ম : ১৮৮১, মৃত্যু : ১লা নভেম্বর ১৯৬৯।

মোবারক আলী সাহেব জার্মানীতে মিশনারী হিসেবে কর্মরত থাকাকালে এক নব-দীক্ষিত আহমদী বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেন। ইসলামের শিক্ষা এবং হযরত রসূল করীম (সা.)-এর আদর্শ প্রতিপালনে এ বিয়ে করেছিলন। তখন জার্মান প্রথম-বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধবিধ্বস্ত-দেশ ছিল। দেশটিতে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। যুদ্ধে অনেক পুরুষ নিহত হওয়ার কারণে বিধবা মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু, নবদীক্ষিত আহমদীর সংখ্যা কম থাকায় নও মুসলিম আহমদী মহিলার বিয়ের সমস্যা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ–'আর তোমরা তোমাদের বিধবা এবং তোমাদের (বিবাহযোগ্য) সদাচারী দাস ও দাসীদের বিয়ে দাও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল করে দিবেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী ও সর্বজ্ঞ' (সূরা আন্ নূর : ৩৩) পালনে ব্রতী হয়ে তিনি এ বিয়ে করেছিলেন। ত্যাগ ও কুরবানীর এক মহান-আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। এ ধর্মপ্রাণ মহিলা মোবারক আলী সাহেব জার্মান থেকে ফিরে আসার সময় বঙ্গদেশে এসেছিলেন। পরে জার্মান চলে যান। তার গর্ভজাত মোবারক আলী সাহেবের কোন সন্তান ছিল না।

খান সাহেবের প্রথম স্ত্রীর গর্ভে দুই ছেলে ও পাঁচ মেয়ের জন্ম হয়। সবার বড় সন্তান সালেহা খাতুন উচ্চ শিক্ষিতা এবং সরকারি উচ্চ-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। ১৯৩৭ সালে তাঁর বিয়ে হয় রংপুরের উচ্চ-শিক্ষিত ধর্মপ্রাণ এক যুবক আব্দুল জব্বার সাহেবের সাথে। এ বিয়ের শুকরিয়া জ্ঞাপনে খান সাহেব জামাতের প্রকাশনা-খাতে একশত টাকা চাঁদা প্রদান করেন। এই চাঁদা বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া কর্তৃক ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত আল ওসীয়্যত ও কিশতিয়ে নূহ্ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশনায় ব্যয় করা হয়। উচ্চ-শিক্ষিত এই দম্পতি এদেশে শিক্ষার আলো জ্বেলে দিতে কাজ করেছেন। আব্দুল জব্বার সাহেব ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত বগুড়া জেলা-স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাদের শিক্ষায় অনেক সুশিক্ষিত সোনার-মানুষ তৈরী হয়। ১৯৯২ সালে তিনি এবং ১৯৭৫ সালে সালেহা খাতুন ইন্তেকাল করেন। তাদের মেয়ে মালিহা বেগমের বিয়ে হয় তবারক আলী সাহেবের সাথে। তবারক আলী সাহেব বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঢাকার আমীরের দায়িত্ব পালন করেন।

মোবারক আলী সাহেবের দ্বিতীয় মেয়ে মোহসেনা বেগমের স্বামী এদেশের আহমদীয়া জামাতের এক নক্ষত্র মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। তিনি আজীবন জামাতের খেদমতে কাজ করেন। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর ছিলেন। কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০০৭ সালে তিনি ঢাকায় ইন্তেকাল করেন এবং মোহসেনা বেগম মৃত্যুবরণ করেছেন ২০০২ সালে ।

মোবারক আলী সাহেবের তৃতীয় সন্তান ওয়াজেদ আলী। তিনি ২০০৭ সালে বগুড়ায় ইন্তেকাল করেন। চতুর্থ সন্তান মইনুল ইসলাম বোবা ছিলেন। তাঁর অতি আদরের এই বোবা ছেলেটি ১৯৪৯ সালে ১৯ বছর বয়সে হারিয়ে যান, আর পাওয়া যায়নি। এতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষা দেন। তখন মানবতার বন্ধু মোবারক আলী মুক ও বধির ছেলে মেয়েদেরকে সমাজে স্বাবলম্বী ও কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৩৯ সালে বগুড়ায় মুক ও বধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সরকারি সংশ্লিষ্ট- কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তিনি অনেক চেষ্টা তদবির করে বিদ্যালয়ের জন্য ভূমি গ্রহণ করত: নিজ উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টি আজও বগুড়া শহরে মুক ও বধির ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিদ্যার আলো ছড়াচ্ছে, প্রতিবন্ধীদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলছে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সন্তান দু'টি মেয়ে জন্মের পর ২/৩ বছরের মধ্যে মারা যান। সপ্তম সন্তান রোকেয়া বেগম। তিনি সবার ছোট হিসেবে মাতাপিতা ও ভাইবোনদের স্নেহস্পর্শ লাভ করেন। সকলের আদরে তিনি বড় হন। তাঁর স্বামী নাজির আহমদ ভূইয়া সাহেব। তিনি একজন বুযুর্গ ব্যক্তি। ১৯৯৩ থেকে

১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তিনি মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের সদর এর দায়িত্ব পালন করেন এবং বর্তমানেও জামাতের বিভিন্ন খেদমতে নিবেদিত আছেন। রোকেয়া বেগম লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশের জেনারেল সেক্রেটারী এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। মোবারক আলী সাহেবের সন্তানদের মধ্যে বর্তমানে একমাত্র তিনিই জীবিত আছেন। তিনি তাঁর পিতার পুণ্য স্মৃতিচারণে বলেন–

"আমার আব্বা খাঁন সাহেব মোবারক আলীর সাহচর্যে আমার বাল্যজীবন কেটেছে। আমি ছোট মেয়ে হিসেবে তাঁর ভালোবাসা পেয়েছি অন্য ভাই বোনদের চেয়ে বেশী। আব্বাকে একদিন আমার বড় বোন মরহুমা সালেহা খাতুনের নিকট বলতে শুনেছি– 'রুকুর জন্য আমার ভালোবাসা ও আদর একটু বেশী। কারণ, ওর জন্য আমি পার্থিব ও বাহ্যিক ভাবে বেশি কিছু করতে পারিনি। তাই তার জন্য প্রাণভরে দোয়া করে গেলাম।' আজ আমার এই পরিণত বয়সে উপলব্ধি করতে পারছি তাঁর দোয়ার ফল।

শ্রদ্ধেয় আব্বা আমাকে প্রত্যেক দিন সকালে কুরআন শরীফ পড়াতেন। একদিনের কথা আমার মনে পরে। তখন আমার বয়স ৯/১০ বছর। সামনে স্কুলের বার্ষিক-পরীক্ষা। আব্বাকে ফাঁকি দিয়ে স্কুলের পড়া পড়তে বসি। তিনি তা দেখে আমাকে ধরে বল্লেন, 'মা, আজ দুনিয়ার পরীক্ষার জন্য কুরআন শরীফ পড়তে চাচ্ছ না। কিন্তু তুমি জীবনে বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তখন এই কুরআন তোমাকে সব পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করবে।' কথাটা যে কত সত্য, তা আজ উপলব্ধি করতে পারছি।

আব্বার ধৈর্য ও তাক্ওয়া কত বেশী ছিল, তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করছি। আমার এক ভাই বোবা ছিলেন। তিনি ১৯৪৯ সালের ১ বৈশাখ ঘর থেকে বাইরে যান, আর ঘরে ফেরে আসেন নি। হয়ত পথ ভুলে হারিয়ে গেছেন। তখন লোকজন তাঁকে বলতেন, 'আপনিতো সারাজীবন দীনের খেদমত করেছেন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথে চলেছেন। তবুও আপনার এত শাস্তি কেন?' তিনি বলতেন, 'খোদা আমাকে পরীক্ষা করছেন।'

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.), স্যার জাফরুল্লাহ্ খান (রা.) এবং অনেকের সঙ্গে আব্বার পত্রালাপ হতো। আমার পরম সৌভাগ্য যে, তাঁর শেষ বয়সে সেক্রেটারী হিসেবে আমি বিভিন্ন জায়গায় চিঠি লিখতাম। তিনি আমাকে ডিক্টেশন দিতেন। এই কাজটা আমার খুব ভাল লাগতো। তিনি সব সময় আমাদের বলতেন, তোমাদের লক্ষ্য হবে 'Simple Living and high thinking. জীবনটা মানুষের সেবায় নিয়োজিত করবে, সেটা অর্থ দিয়ে হোক, আর পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দিয়েই হোক।' তাঁর কথা-বার্তা ছিল সব সময় মমতাভরা। খুব আস্তে আস্তে কথা বলতেন। মানুষকে খুব ভালোবাসতেন। আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল না।

বাসার কাজের-লোকদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করতেন। আমাদের বলতেন, ওরা তোমাদের সাহায্যকারী। তাদের অসুখের সময় তিনি নিজ হাতে তাদের সেবা করতেন।

তিনি মেয়েদের লেখাপড়ায় খুব উৎসাহ দিতেন। আমি Lady Health Visitor কোর্সে ডিপ্লোমা করি। আমাকে এ ডিপ্লোমা কোর্স করার জন্য খুব উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলতেন, 'তুমি নিজের এবং সমাজের অবহেলিত মেয়েদেরকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করতে কাজ করবে। পূর্বে আমি সরকারি চাকুরি করতাম। পরে চাকুরি থেকে ইস্তেফা দেই। পুনরায় ২০ বছর পর এক এনজিও-তে প্রশিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। খোদার বিশেষ রহমতে গ্রাম্য-মহিলাদের ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবায় কাজ করেছি। তখন আমার মনে হয়েছে, আমার আব্বার যে স্বপ্ন ছিল, তা কিছুটা হলেও আল্লাহ্ তাআলা পূরণ করেছেন। তাঁর ব্যবহার খুব অমায়িক ও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ছিল।

মরহুমা ওয়াজেদা খানম ছিলেন আমার মা। তিনি বগুড়া নিবাসী মরহুম ফজলুর রহমানের প্রথম সন্তান। আমার নানা একজন নামকরা মোক্তার ছিলেন। ছোটবেলায় তাঁর মা মারা যান। তিনি ষষ্ট শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। সেই সময় বগুড়া গার্লস স্কুল ষষ্ট শ্রেণী পর্যন্তই ছিল। বার বছর বয়সে আমার পিতার সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর দুই মেয়ে-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বড় মেয়ের বয়স যখন তিন বছর এবং ছোট মেয়ের বয়স এক বছর, তখন খাঁন সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর আহ্বানে জিন্দেগী ওয়াকফ করেন এবং লন্ডন ও জার্মান চলে যান। সেখানে তিনি মিশনারী হিসেবে চার বছর জামাতের খেদমত করেছেন। সেই সময় মিশনারীদের সংসার চালানোর মতো আর্থিক সামর্থ ছিল না। আমার মা গ্রামে শশুরালয়ে দুই সন্তান নিয়ে বসবাস করতেন। ধনী পিতা মেয়েকে নিজ বাড়ীতে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বাপের বাড়ীতে যান নি। তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু, তাহাজ্জুদ গুজার মহিলা ছিলেন। মেহমান নেয়াজী এবং রুগী সেবায় পারদর্শী ছিলেন। ধর্ম কাজে স্বামীকে সহযোগিতা করেছেন। আমার মা ৮১ বছর বয়সে ১৯৮৩ সালে মারা যান।"

মোবারক আলী সাহেব পারিবারিক জীবনে আদর্শবান মানুষ ছিলেন। তিনি স্ত্রীর জন্য উত্তম-স্বামী এবং সন্তানদের জন্য উত্তম পিতা ছিলেন। সন্তানদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত-মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয়-শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেন–'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সব চাইতে উত্তম, যে তাঁর পরিবারের নিকট উত্তম এবং আমি আমার পরিবারের জন্য তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম' (আবু দাউদ)-এর শিক্ষা পালনে তিনি উত্তম-মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সর্বক্ষেত্রে সফল ছিলেন। ১৯৩৮ সালে হজ্জব্রত পালনে তাঁর সৌভাগ্য হয়।

দেশে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের এই উত্তম সেবক ইহজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথার্থভাবে পালনে পর ১ নভেম্বর, ১৯৬৯ তারিখ রাত ২টা ৩০ মিনিটে পরপারে পাড়ি দিয়েছেন। বাংলার আকাশে উদিত এই উজ্জ্বল নক্ষত্রের অস্ত গমন হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। বগুড়ায় তাঁর নিজ-বাড়িতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর পার্শ্বে তাঁর স্ত্রীকেও সমাহিত করা হয়েছে। তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তাঁর ওসীয়্যত নং ২৬৪৮। বেহেশতী মাকবেরায় তাঁর নাম ফলক (কদবা) লাগানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বাংলার এই কিংবদন্তী জার্মান বিজয়ী মোবারক আলীকে বেহেশতের উচ্চ মোকাম দান করুন, আমীন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

৩ অক্টোবর, ২০১২

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর সংঘঠিত হামলায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের উদ্বেগ :

সম্প্রতি কক্সবাজার ও সংলগ্ন এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনদের উপর সংঘটিত আক্রমণ, ঘর-বাড়ী এবং উপাসনালয় ভাংচুড়, অগ্নি সংযোগ ও লুটপাটের ঘটনায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ গভীর উদ্বেগ, দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করছে।

পবিত্র ও শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারী দাবীকারী একদল সন্ত্রাসী ও ধর্মান্ধের এহেন কর্মকান্ড কখনই ইসলামী নয়, বরং এটা ইসলাম ও মহানবীর (সা.) শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যারা এ ধরনের জঘন্য কাজ করে, প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন ধর্ম নেই! এরা ধর্মের লেবাস পড়ে, ধর্মকে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। এরা ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভুতিকে কাজে লাগিয়ে মিথ্যা প্রচার করে ফায়দা লুটে। যুগে যুগে আমরা তা-ই দেখে এসেছি।

ইসলাম মানবতার ধর্ম; পবিত্র কুরআন অন্য ধর্মাবলম্বীর জীবন-সম্পদ, উপাসনালয় ও ধর্মীয় নেতাদের সম্মান করা ও তাদের রক্ষার নির্দেশ প্রদান করেছে। মহানবী (সা.) ছিলেন রহমতুল্লিল আলামীন, সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য আশিস স্বরূপ। শুধু তাই নয়, তিনি (সা.) অকারণে কোন পশু-পাখিকেও কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন। তাই এই মহা মানবের প্রচারিত ও আচরিত ধর্মের নামে যারা এ ধরনের জঘন্য ও অমানবিক কাজ করে, মূলতঃ ওরাই ইসলাম বিরোধী, আল্লাহ্ ও রসূলের (সা.) অবমাননাকারী, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্যবাহী দেশ বাংলাদেশের শত্রু।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, এহেন কর্মকান্ডের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং এ ধরনের যে কোন অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সম্মিলিত সামাজিক প্রতিরোধের আহ্বান জানাচ্ছে। সরকার ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পবিত্র দায়িত্ব হবে অপরাধীদের খুঁজে বের করে আইন অনুযায়ী বিচারের ব্যবস্থা করা।

আহমদ তবশির চৌধুরী
মিডিয়া ইনচার্জ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১

কবিতা-

মহা মহীয়ানের চরণের তলে

–জাফর আহমদ

তুমি এসেছো হে প্রিয়ংবদা প্রাণ,
আমি তো শাদ্দাদ নই যে
তোমাকে ভরিয়ে দেবো
বালাখানা অফুরান!

মায়াবতী নফসের কবলে পড়ে
মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে কেউ
আমিতো ফেরেশ্‌তা নই, তাই
কিছু তার উছলে পড়ে ঢেউ।

আমি তাই বিপন্ন এক প্রাণ
সকলেই হয়নাকো যীশু
এলি ছুটিয়া যবে
করিবেই রাফা–পরিত্রাণ।

তাহলে আমার কি হবে এখন
মরণকথা বড় পড়িছে স্মরণ!

তুমি এসেছো হে মহামতি মসীহ্
আমিতো পিলাত নই, যীহুদাও নই
আমিতো শুধু তোমার পরম প্রিয়নবী
মহা মহীয়ান মুহাম্মদের গোলাম হই।

এই একটিমাত্র যোগ্যতা আমার
একমাত্র অহংকার,
আমাকে পরাস্ত করে এই রণাঙ্গনে
এমন সাধ্য কার!

মহা মহীয়ান মুহাম্মদের চরণের তলে
আমার এ নত শির লুটাইয়া পড়ে
লুটাইয়া পড়িতে চায় বিশ্বভুবন
মহা পৃথিবীর সৃজনতো শুধু তাঁহার তরে!

হে প্রভু-প্রতিপালক আমার!
কিছুই তো নাই, শুধু এই যোগ্যতার বলে
অধমকে তরাইয়া নিয়া
হাশর করিও পার।

নবীনদের পাতা-

যুদ্ধবন্দীদের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সদাচরণ

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা-আলে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম্মাজীদ।
আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা-আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম্ মাজীদ।

খোদা তাআলার এ এক বড় নিদর্শন এবং ইসলামের সত্যতার এক মহিমান্বিত প্রমাণ যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের ঘটনাবলী যেরুপ প্রকাশ্যে বিদ্যমান রয়েছে সেরূপ প্রকাশ্যে অন্য আর কোন নবীর জীবনের ঘটনাবলী বিদ্যমান নেই। অবশ্য এতে সন্দেহ নেই যে এইরূপ বিস্তারিত বিবরণ থাকার দরুনই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর যত বেশি আপত্তি উত্থাপন করা সম্ভব হয়েছে তত বেশি আপত্তি অন্য আর কোন নবীর অস্তিত্বের উপর উত্থাপন করা সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, সেই সকল আপত্তি অপনোদনের পর মানুষ যেরূপ পরিশ্রুত হৃদয়ে এবং পরিতুষ্ট চিত্তে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্তার সাথে প্রেম করতে পারে, সেরূপ প্রেম অন্য আর কোন মানুষের সাথে কখনই করতে পারে না। কেননা যার জীবনের ঘটনাবলী গোপন থাকে তার সাথে ভালবাসায় বিপত্তি ঘটবার আশংকা সব সময়েই থেকে যায়। মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন তো ছিল একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ। শত্রুদের যাবতীয় আপত্তি খন্ডিত হয়ে যাওয়ার পর সেই গ্রন্থের এমন কোন পৃষ্ঠা আর বাকী থাকে না, যেখান থেকে তাঁর জীবনের অনুরূপ আরও কোনও নতুন দিক বা আপত্তি বের করা সম্ভব। কিংবা তার এমন কোনও পাতা আর বাকী থাকে না যা খুললে অন্য ধরনের আরও কোন তত্ত্ব বা হাকীকত আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হতে পারে।

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) সারা দুনিয়ার সর্দার ছিলেন। রসূল করীম (সা.) নিজের স্বার্থে কোন প্রতিশোধ নিতেন না বরং শত্রুদের সাথেও সব সময় ভাল আচরন করেছেন। যুদ্ধে যে সকল যুদ্ধবন্দী হত তাদের বিশেষ খেয়াল রাখতেন। যাকে খোদা তাআলা রাহমাতুল্লিল আলামীন করে পাঠিয়েছেন সমগ্র দুনিয়ার জন্য তিনি কিভাবে অন্যের প্রতি অবিচার করতে পারেন। রসূলে করীম (সা.) যুদ্ধবন্দীদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন তার কয়েকটি ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

বদরের যুদ্ধবন্দী :– বদরের যুদ্ধের এই বিজয়ে রসূলে করীম (সা.) খুশীও হয়েছিলেন। কেননা যে ভবিষ্যদ্বাণী চৌদ্দ বৎসর যাবৎ তাঁর মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছিল, যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পূববর্তী নবীগণ এই দিনের সম্পর্কে করেছিলেন তা সবই পূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু মক্কার বিরুদ্ধবাদীগণের ভয়াবহ পরিণতিও ছিল তাঁর চোখের সামনে। তাঁর জায়গায় যদি অন্য কেউ হত তাহলে সে আনন্দে উল্লাসিত হয়ে লাফাতো। কিন্তু যখন তাঁর সামনে দিয়ে মক্কার যুদ্ধবন্দীদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তাঁর এবং তাঁর প্রিয় সাথী হযরত আবু বকর (রা.) এর চক্ষু থেকে ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরছিল। এই সময় হযরত উমর (রা.) যিনি পরবর্তীতে তাঁর দ্বিতীয় খলীফা হয়ে ছিলেন, সম্মুখে এলেন এবং আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে এত বড় বিজয় ও খুশীর পরেও আঁ হযরত (সা.) কাঁদছেন কেন! তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাকেও বলুন এ সময় কান্নার কারণ কি? তা যদি আমার জন্যও কান্নার কারণ হয় তাহলে আমিও কাঁদবো। অন্ততঃ আপনার কান্নার ভাগী হয়ে চোখে মুখে কান্নার ভঙ্গী করবো। তিনি (সা.) বললেন, দেখতে পাচ্ছ না, আল্লাহ্ তাআলার নাফরমানী করার জন্য মক্কাবাসীদের কি অবস্থা হয়ে গেছে।

মদীনায় ফিরে আসার পথে রাত্রিতে যখন তিনি (সা.) ঘুমাবার জন্য শুয়ে পড়লেন, তখন সাহাবারা (রা.) দেখতে পেলেন যে, তিনি ঘুমাতে পারছেন না। শেষে তাঁরা ভেবে চিন্তে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর অর্থাৎ (সা.) এর চাচা আব্বাস যেহেতু রশি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় থাকার দরুন শুইতে পরছেন না। এবং যেহেতু তার কষ্টজনিত গোঙ্গানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল, সেহেতু তার কষ্টের প্রতি খেয়াল করেই তিনি ঘুমাতে পারছেন না। তাই তাঁরা নিজেরা পরামর্শ করে হযরত আব্বাসের বাঁধনগুলি ঢিলা করে দিলেন। হযরত আব্বাস শুয়ে পড়লেন এবং রসূলে করীম (সা.) চোখেও ঘুম এসে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিনি চমকে উঠলেন, তাঁর চোখ খুলে গেল এবং তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আব্বাস কেন চুপ হয়ে গেছে? তার গোঙ্গানীর শব্দ কেন শোনা যাচ্ছে না? তাঁর ভয় হচ্ছিল কষ্টের কারণে তিনি বেহুশ তো হয়ে যান নি? সাহাবারা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা আপনাকে কষ্ট পেতে দেখে তার বাঁধনটি ঢিলা করে দিয়েছি।

তিনি (সা.) বলেন, 'না, না, এটা অন্যায়, এ হতে পারে না। আব্বাস যেমন আমার আত্মীয়, অন্যান্য যুদ্ধবন্দীরাও তেমনি অন্যান্যদের আত্মীয়। হ্যাঁ, সকল বন্দীর বাঁধন ঢিলা করে দাও, যাতে তারাও আব্বাসের মত শুইতে পারে, নয় তো আব্বাসের বাঁধন আবারও শক্ত করে দাও। তখন সাহাবারা রসূল করীম (সা.) এর কথা শুনে সকল বন্দীর বাঁধন ঢিলা করে দিলেন। আর তাদের হেফাযতের সকল দায়িত্ব নিজেদের স্কন্ধে নিয়ে নিলেন। যারা বন্দী হয়েছিল তাদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানতো, তিনি (সা.) তাদের জন্য শুধু মাত্র এতটুকু মুক্তিপন ঠিক করলেন যে, তাদের প্রত্যেকে মদীনার দশটি করে ছেলেকে পড়ালেখা শিখাবে। অন্যদের মধ্যে যাদের মুক্তিপণ পরিশোধ করার মত কেউ ছিল না, তাদেরকে এমনিতেই মুক্তি দিয়ে দিলেন। যাদের মুক্তিপণ দেওয়ার আর্থিক সামর্থ্য ছিল তাদের কাছে পরিমিতভাবে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন। আর এই পন্থা অবলম্বন করে তিনি আদিকাল থেকে চলে আসা যে প্রথা, অর্থাৎ যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাসে পরিণত করার যে প্রথা, তা উচ্ছেদ করে দিলেন।

একবার 'তাঈ' গোত্রের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তাঈ গোত্রের কয়েকজন যুদ্ধবন্দী হয়। তাদের মধ্যে আরবের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি

'হাতেম তাঈ' এর এক মেয়েও ছিল। যখন সেই মেয়ে বলল যে আমি 'হাতেম তাঈ' এর মেয়ে তখন রসূলে করীম (সা.) তার কথা শুনে তার সাথে অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে উপস্থিত হন। আর রসূলে করীম (সা.) তার সুপারিশক্রমে তার গোত্রের শাস্তি ক্ষমা করে দেন। (সীরাত হালবিয়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২২৭)

যুদ্ধবন্দীদের সাথে রসূলে করীম (সা.) সব সময় ভাল আচরণ করেছেন এমনকি তাদের আরাম আয়েশের ব্যবস্থাও তিনি (সা.) করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে– রসূলে করীম (সা.) যুদ্ধবন্দীদের আরামের প্রতি খেয়াল রাখার জন্য নসীহত করতে গিয়ে বলেন–নিজেদের আরামের চেয়ে যুদ্ধবন্দীদের আরামের প্রতি বেশি খেয়াল রাখ। (তিরমিযী)

হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন–যার কাছে কোন যুদ্ধবন্দী রাখা হয় সে যেন তাকে তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায় আর তাকে যেন তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। (বুখারী)

যুদ্ধবন্দীদের মাঝে একজন যুদ্ধবন্দী আবু আযিয বিন উমায়ের (রা.) থেকে বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনি বলেন, হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর কথার প্রভাব এমনভাবে হয়েছিল যে, যদি তাদের কাছে একটি ছোট রুটির টুকরাও থাকত তাহলে তা আমাকে দিত আর তারা অভুক্ত থাকত। আনসাররা আমাকে পাকানো রুটি দিত আর তারা খেজুর খেত। যাই হোক মহানবী (সা.) মদীনায় পৌঁছার পর সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ চাইলেন যে যুদ্ধবন্দীদের সাথে কি করা যায়। সেই যুগে যুদ্ধবন্দীদের হত্যা অথবা স্থায়ীভাবে দাস বানিয়ে রাখত। আর তখন পর্যন্ত যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে কুরআন করীমের কোন আয়াত ও অবতীর্ণ হয়নি। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে ফিদিয়া নিয়ে তাদের মুক্ত করে দেয়া হোক। হযরত উমর (রা.) বলেন, তাদের হত্যা করা উচিত। তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.) এর পরামর্শ গ্রহণ করলেন।

যুদ্ধবন্দীদের মাঝে সাহল বিন আমর (রা.) ও ছিল। তার বক্তৃতা খুবই বাগ্মীতাপূর্ণ ছিল। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতেন। বন্দী হওয়ার পরে উমর (রা.) বলেন, তার সামনের দুটি দাঁত উঠিয়ে ফেলা হোক যেন সে পরবর্তীতে (সা.) কে গালমন্দ দিতে না পারে। কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। পরবর্তীতে যখন মক্কা বিজয় হল তখন সাহল (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের স্বপক্ষে বক্তৃতা করেন। আর অসংখ্য লোক ইসলাম গ্রহণ করে।

রসূলে করীম (সা.) কোন সময় কাউকে বাধ্য করতেন না ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বিশেষ ভাবে কোন যুদ্ধবন্দীকে। কেননা, ইসলাম ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই। যেরূপে কুরআন করীমে বলা হয়েছে, "লা ইকরাহা ফিদ্দীন" (বাকারা : ২৫৭)। এবং "লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়াদ্বীন" (কাফিরূন :৭)।

মুসলীম শরীফের হাদীস রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে সেই ক্রীতদাসের শরীরের প্রতিটি অংশের বিনিময়ে তার শরীরের প্রতিটি অংশের জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।

রসূলে করীম (সা.) এর জীবনাদর্শ পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে তিনি (সা.) কিভাবে যুদ্ধবন্দীদের সাথে উত্তম আচরণ করেছেন ও করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি (সা.) যে দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তার দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাই এরূপ আযীমুশশান নবী (সা.) এর উপর লক্ষ লক্ষ দরূদ ও সালাম। ইয়া রাব্বি সাল্লি আলা নাবিয়্যেকা দায়েমান, ফিহাযিহিদ্দুনিয়া ওয়া বা'সিন সানী।

নাবিদ আহমদ লিমন
ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড,ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ

১। দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩। ন্যুনতম কোর্স ফি
৪। মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫। সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬। প্রত্যেক ক্লাসের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭। ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮। কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আমাদের কোর্স সমূহঃ

1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Graphics Design
4. Elementary English
5. Familiar with Office Etiquette & Manners

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ

১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ

২. কোর্স বাবদ প্রদেয় ঃ ভর্তি ফি -১০০ টাকা, কোর্স ফি-৫০০ টাকা এবং সার্টিফিকেট ফি -১০০ টাকা, সর্বমোট- ৭০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

মোহাম্মদ মোহাইমিনুল ইসলাম
ইন্সট্রাক্টর, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৯১৪০৪৭৬০৭
ই-মেইল ঃ
mibakul@yahoo.com

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
কায়েদ, ম.খো.আ, ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ
mdyounus.ali@gmail.com

নবীনদের পাতা-

ইবাদতের সাধারণ দর্শন

যেভাবে উপরে ইঙ্গিত এসেছে যে মানুষকে এইজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যেন তার মাধ্যমে দুই জগতের সৃষ্টিকর্তার সত্তার প্রকাশ আর তার গুণাবলীর প্রকাশ হয়, লুকানো ফিতরত বা স্বভাব আর প্রকৃতির গোপন রহস্য যেন প্রকাশ হয়ে যায় অর্থাৎ মানুষ যেন খোদা বিলীন সত্তা হয় আর এভাবে তার সদৃশ্য হয়ে বিশ্বজগতের সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে, এজন্য মানুষকে আব্‌দ (দাস) বলা হয়েছে কেননা ইবাদতের এক অর্থ কারো নকশা বা ছাপকে গ্রহণ করা আর মানুষকে এমন সর্গীয় শক্তি ও উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে যার সাহায্যে সে খোদার গুণাবলীর পূর্ণ নকশা বা ছাপকে উপস্থাপন করতে পারে আর তাকে নিজের ভেতর সৃষ্টি করার পূর্ণ যোগ্যতা রাখে। (মলফুজাত, ষষ্ঠ খন্ড, ২১ পৃ:, তফসিরে কবীর, ১ম খন্ড, পৃ: ২৮)

আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে বলেন–'ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়াবুদুন'

অর্থাৎ আমি জিন ও ইনসানকে শুধু ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ এই জন্য যে সে যেন আমার প্রকাশের কারণ ও আমার গুণাবলীর প্রকাশক হয়।

এই আয়াতে করীমার তফসির সেই হাদীসে কুদসি করেছে যার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা বলেন– আমি এক গোপন সম্পদ ছিলাম অত:পর আমি চাইলাম যে আমি যেন পরিচিত হই আর দুনিয়াতে জানা যাই। এইজন্য আমি আদমকে সৃষ্টি করেছি।

(মজিল আলখাফা ওয়াল ইলবাস, ২য় খন্ড, পৃ: ১৩২, মুসান্নাফাহ্ ইসমাইল বিন আল আজলানী)

এর অধিক স্পষ্টতা হযরত নবী করীম (সা.)-এর সেই ইরশাদে আছে– আল্লাহ্ তাআলা আদমকে নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন (বুখারী কিতাবুল ইসতেযান পৃ: ৯০৯ ও মুসনাদ আহমদ পৃ: ৩২৩)। এই ইরশাদের এটাই অর্থ যে মানুষের জন্মের উদ্দেশ্য সৃষ্টিকর্তার সত্তার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ কেননা সে খোদার গুণাবলীর প্রকাশক হতে পারে। আর তার কুদরত বা আকৃতির লোকানো বা গোপনীয়তার উপর থেকে পর্দা উঠানোর জ্ঞানগত সামর্থ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণেই উদ্ভাবন, আবিষ্কারসমূহ আর নতুন নতুন আবিষ্কারের যে যোগ্যতাসমূহ মানুষকে দেওয়া হয়েছে সেটা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেওয়া হয় নাই। এই তাৎপর্যের ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করে সাইয়্যেদেনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন–

খোদা তাআলার সত্তার মধ্যে নিজের মহানত্ত্ব, নিজের খোদাই, নিজের মহত্ত্ব, নিজের মর্যাদা নিজের বাদশাহী প্রকাশের এক তাগাদা পাওয়া যায় আর শাস্তি ও পুরস্কার আর আনুগত্য, অনুসরণ ও উপাসনার তাগিত এই তাগাদারই শাখা। এই রুবুবিয়্যতের প্রকাশ খোদাইয়্যাতের উদ্দেশ্য থেকেই এই ধরন ও রকমের জগত তিনি সৃষ্টি করেছেন। নতুবা যদি তার সত্তার মধ্যে এই জোশ প্রকাশ না পাওয়া যেত তাহলে তিনি কেন সৃষ্টি করার প্রতি অযথা মনযোগী হতেন আর কে তার মাথায় বোঝা চাপিয়েছিল যে অবশ্যই এই জগত সৃষ্টি কর আর আত্মাসমূহকে শরীরের সাথে সম্পর্ক দিয়ে সেই মুসাফিরখানাকে যা দুনিয়া নামে পরিচিত নিজের অদ্ভুত কুদরতের জায়গা বানাও। আসলে এর মধ্যে কোন চাওয়ার শক্তি ছিল যা এই ভিত্তি রাখার প্রতি সঞ্চালিত হয়েছে। এরই দিকে তার পবিত্র কালাম কুরআন শরীফের মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, খোদা তাআলা সমগ্র দুনিয়াকে এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যাতে তার খালেকিয়াতের গুণের সাথে পরিচিত করা যায় আর সৃষ্টি করার পর নিজের সৃষ্টিসমূহের উপর দয়া ও করুণার বর্ষণ করলেন যেন তার দয়া ও করুণার গুণের সাথে পরিচিত করা যায়। এভাবে তিনি শাস্তি ও পুরস্কার দিয়েছেন যেন শাস্তিদাতা ও পুরস্কারদাতা হওয়াকে চিহ্নিত করা যায়। মোটকথা নিজের বিস্ময়কর কাজ দ্বারা এটাই ইচ্ছা রাখেন যেন তাকে চেনা যায় আর চিহ্নিত করা যায়। তাই যখন জগতকে সৃষ্টি করা আর পুরস্কার ও শাস্তি প্রভৃতি থেকে প্রকৃত উদ্দেশ্য খোদা তাআলার তত্ত্বজ্ঞান যা অতি উত্তম উপাসনা ও ইবাদত, তো এথেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা নিজেই তাগাদা দেন যেন তার তত্ত্বজ্ঞান যার তাৎপর্য পরিপূর্ণ উপাসনা ইবাদতের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তাঁর বান্দাদের দ্বারা যেন তা অর্জিত হয়। যেভাবে একজন সুন্দর নিজের পূর্ণ সৌন্দর্যের কারণে নিজের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করতে চায় তাই খোদা তাআলা যার মাঝে প্রকৃত সৌন্দর্যের উৎর্ষতার শেষ তিনিও নিজের সত্তাগত জোশ দ্বারা চান যে তিনি যেন পূর্ণতাপ্রাপ্ত বা উৎকর্ষতাপ্রাপ্ত লোকদের মাঝে প্রকাশিত হন (সুরমায়ে চশমায়ে আরিয়া, পৃ: ২১৮-২১৯)।

ইবাদতের আরো একটি অর্থ কারো হয়ে যাওয়া, তার সামনে নত হওয়া, তার মাঝে বিলীন হওয়া, তার সামনে বিনয়ী ও নম্রতা অবলম্বন করা আর তার কথা মানা। আর মানুষও নিজের সত্তাকে এক সর্বোচ্চ সত্তার সামনে মিটিয়ে দেওয়া, তার প্রেমে বিলীত হওয়া আর তারই হয়ে যাওয়ার পরিপূর্ণ সামর্থ বা যোগ্যতা রাখে। এইজন্য তাকে আব্‌দ (দাস) বলা হয়েছে।

সুতরাং এই অর্থের দিক থেকে ইবাদত শুধু এমন পরিপূর্ণ সত্তারই হতে পারে যিনি নিজের উৎকর্ষতা বা পূর্ণাঙ্গতার মাঝে একক হন আর তার কোন অংশীদার না থাকে আর যার অনুগত্য ও অনুসরণে মানুষ সর্বাবস্থায় অনুগত হয়, এমন সত্তা শুধু আল্লাহ্ তাআলারই কেননা তিনি ব্যতীত কেউ নাই যাকে প্রকৃত অর্থে আনুগত্য করা যেতে পারে আর যার সত্তাকে নির্বাচন করে মানুষ তারই হয়ে যায় আর তারই আশ্রয়ের নিচে নিজেকে নিয়ে আসে।

প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ তাআলার বান্দা (আব্‌দ) বলার এক কারণ এই যে, মানুষ আল্লাহ্ তাআলার সামনে নিজের কৃতজ্ঞতার আবেগকে প্রকাশ করে আর তার দয়া বা অনুগ্রহসমূহকে নিজের মুখ দ্বারা স্বীকার বা স্বীকৃতি প্রদান করে, কেননা মানুষ স্বভাবগতভাবে নিজের মোহ্‌সেনের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে বাধ্য হয়, যেভাবে হাদীসে এসেছে–

মানুষকে বানানোই হয়েছে এমনভাবে যে, সে নিজের মোহসেন বা দয়াকারীর সাথে ভালবাসতে বাধ্য হয় (জামেউস সাগির ১ম

খন্ড, পৃ: ১২০, বায়হাকি)। আল্লাহ্ তাআলার প্রকৃত দাস হওয়ার জন্য এটাও জরুরী যে, মানুষ যেন গুনাহ ও মন্দসমূহ থেকে মুক্তি পায় আর নিজের মনকে পবিত্র করে কেননা আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র আর পবিত্র লোকই তার দরবারে অনুমতি পেতে পারে। এই কারণেই সমস্ত নির্ধারিত ইবাদতের মধ্যে এই বিষয়কে অগ্রগণ্যে রাখা হয়েছে যেন এর মাধ্যমে মানুষের আত্মা মন্দসমূহ থেকে পবিত্র হয়ে যায় আর তাকে এমন শক্তি মিলে যায় যে, সে বিভিন্ন ধরনের কামনা-বাসনাকে ছেড়ে দেওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। একদিকে আল্লাহ্ তাআলার সাথে তার সম্পর্কাদি সঠিক বা বিশুদ্ধ হয়ে যায় আর অন্যদিকে মাখলুকে ইলাহী বা খোদার সাথে তার বিষয়সমূহ সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও স্পষ্ট থাকে (তফসিরে কবির, পৃ: ৩৩৩)।

ইবাদতের দুইটি অংশ এক খোদাভীতি আর অন্যটি খোদার সাথে ভালবাসা। এই দুইটি বিষয় মানুষকে পবিত্রতার ঝরনার দিকে নিয়ে যায় আর তার আত্মা নরম বা কোমল হয়ে ঐশ্বর্যের দিকে বয়ে যায় আর দাসত্বের প্রকৃত রত্ন তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায় আর দুনিয়ার সমস্ত প্রেম-ভালবাসাকে নশ্বর ও অস্থায়ী মনে করে সে শুধু আল্লাহ্ তাআলাকেই দুনিয়াতে প্রকৃত প্রেমের পাত্র হিসেবে বিশ্বাস করতে শুরু করে।

ভয় এবং ভালবাসা দু'টি এমন জিনিস যে বাহ্যত এগুলোর একত্রিত হওয়া অসম্ভব মনে হয় যেমন এক ব্যক্তি যাকে সে ভয় করে তাকে কিভাবে ভালবাসা যায় কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ভয় এবং ভালবাসা এক ভিন্ন রঙ্গ রাখে। যেভাবে মানুষ খোদার ভয়ে উন্নতি করবে সেভাবে খোদা তাআলার ভয় বিজয়ী হয়ে মন্দসমূহ ও খারাবির প্রতি ঘৃণা প্রদান করে পবিত্রতার দিকে নিয়ে যাবে। আর যে মাত্রই সে খোদা প্রেমে উন্নতি করতে থাকবে তখন ইবাদতের মধ্যেও এক স্বাদ ও আনন্দ হাসিল হবে। হ্যাঁ এমন স্বাদ আর এমন আনন্দ যা দুনিয়ার সমস্ত স্বাদ আর আত্মার সমস্ত আনন্দ থেকে সবচেয়ে মূল্যবান ও উচ্চতর।

ইসলাম ইবাদতকে চারটি নীতিগত উদ্দেশ্যে বন্টন করে : (১) সেই ইবাদত যার উদ্দেশ্য খোদা তাআলার সাথে ভালবাসা আর তাঁর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে। (২) সেই ইবাদত যা মানুষের দেহের সংশোধন আর তাকে কুরবানী দেওয়ার প্রতি প্রস্তুত করার জন্য হয় আর যার থেকে আত্মা এক বিশেষ জ্যোতি বা আলো অর্জন করে।

(৩) সেই ইবাদত যা মানুষের ভিতর কেন্দ্রের প্রতি স্পৃহা এবং একতা ও সাক্ষাত বা মিলনের অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্য নির্ধারণ করা হয়।

(৪) সেই ইবাদত যা মানবজাতির অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে আত্মপ্রশান্তি ও এক আনন্দ সৃষ্টি করার জন্য নির্ধারণ করা হয়।

ইসলাম ইবাদতের এই চারটি নীতিগত উদ্দেশ্যকে নির্ধারণ করে আর এই উদ্দেশ্যসমূহ অনুযায়ী ইসলাম বিভিন্ন ইবাদতের নির্ধারণ করেছে আর এই নীতিকে বাস্তবায়ন করে ইসলাম এই দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে যে ইবাদত শুধু এই বিষয়ের নাম নয় যে, মানুষ শুধু খোদা তাআলার ধ্যান লাগাক বরং মানব সমাজের দিকে মনযোগ দেওয়ার মাধ্যমেও খোদা তাআলার ইবাদতের ফরজ আদায় হয়। এভাবে ইসলাম এ বিষয়ও উপস্থাপন করেছে যে, ইবাদত শুধু ব্যক্তিগত নয় বরং সম্মিলিতভাবেও হয়। মানুষের শুধু এটাই ফরজ নয় যে, সে খোদা তাআলার সামনে দাঁড়িয়ে যাক বরং মানুষের এটাও দায়িত্ব যেন সে নিজের ভাইদেরকেও খোদা তাআলার সামনে পেশ হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। এই জন্য কুরআনের যতগুলো আদেশাবলী ইবাদত সম্পর্কে রয়েছে সেগুলো ব্যক্তিগতও আছে এবং সমষ্টিগতও।

(ভূমিকাংশ, তফসিরুল কুরআন, পৃ: ৪৫২, ফিকাহ্ আহমদীয়া, ১ম খন্ড)

অনুবাদ: **আসিফ আহমদ**

'ধর্মে কোন ধরনের বলপ্রয়োগ নেই।'....

(সূরা ঃ আল বাকারা : ২৫৭)

তুমি বল, এ সত্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (প্রেরিত)। সুতরাং যে চায় সে ঈমান আনুক এবং যে চায় সে অস্বীকার করুক। ....

(সূরা ঃ আল কাহ্‌ফ : ৩০)

"আর কথা বলার ক্ষেত্রে তার চেয়ে উত্তম কে হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং বলে, 'নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন'?"

(সূরা ঃ হামীম আস্ সাজ্‌দা : ৩৪)

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর।"....

(সূরা ঃ আত্ তাহ্‌রীম : ৭)

সংবাদ

খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৪৩তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৪৩তম স্থানীয় ইজতেমা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশন ২০ সেপ্টেম্বর বাদ মাগরিব অনুষ্ঠিত হয়। আহমদ তারেক নুরুদ্দিন মোহতামীম তালিম মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ এতে সভাপতিত্ব করেন। কুরআন তেলাওয়াত ও কোরাস পরিবেশনের পর মোহতরম মঞ্জুর হুসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া দোয়া ও উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব শেখ সাদী, কায়েদ। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জনাব এস এম ইব্রাহীম, রিজিওনাল কায়েদ, মৌলবী আসাদ উল্লাহ্ আসাদ, মোয়াল্লেম এরপর সভাপতি বক্তব্য আব্দুল মোমেন, সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সভাপতিত্বে সমাপনী অধিবেশন ১ম স্থান অধিকারী খোদ্দাম ও আতফাল কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশন করেন। শতবর্ষ জুবিলী, খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৭৫ বছর পূর্তিতে অত্র মজলিসের কর্মসূচী ও বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করেন কায়েদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। আনসার সুলতানুল কলমের উপর বক্তব্য রাখেন মোহতামীম তালিম জনাব আহমদ তারেক নুরুদ্দিন। সর্বশেষ মোহতরম সদর সাহেব সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন এরপর সম্মানিত মেহমানগণ পুরস্কার প্রাপ্ত খোদ্দাম আতফালদের মাঝে পুরস্কার ও সনদ পত্র তুলে দেন। শেষে আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ইজতেমায় উপস্থিত রাখেন। ২ দিন ব্যাপী ইজতেমায় ৪টি গ্রুপে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। ২১ সেপ্টেম্বর বাদ জুমুআ মোহতরম মোহাম্মদ খোদ্দাম ৫৫ জন, আতফাল ৩৫ জন এবং ৮ জন সাবেক কায়েদ উপস্থিত ছিলেন।

এখতিয়ার উদ্দিন শুভ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার দপ্তরে জরুরী ভিত্তিতে একজন গাড়ীচালক প্রয়োজন। ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ আহমদী গাড়ীচালকদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান কারা যাচ্ছে। আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার বরাবর লিখিত দরখাস্ত স্থানীয় জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্টের সুপারিশসহ আগামী ৩০ অক্টোবর তারিখের মধ্যে ঢাকা জামাতের দপ্তরে পৌঁছতে হবে। বেতন অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে আলোচনা সাপেক্ষ।

বশির উদ্দিন আহমদ
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা

মজলিস আনসারুল্লাহ ঘাটুরার ১৮তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ২ দিন ব্যাপী ১৮ তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রিজিওনাল নাযেম জনাব মোশারফ হোসেন। ইজতেমার শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন রহিম আহমদ হাজারী। এরপর সভাপতি আহাদ পাঠ ও দোয়া পরিচালনা করেন। নযম পাঠ করেন মুকবুল আহমদ। এরপর স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব রহিম আহমদ হাজারী। নসিহতমূলক বক্তব্য পেশ করেন মৌ. এনামুল হক রনী, মোয়াল্লেম ঘাটুরা, জনাব মোহাম্মদ মোছা মিয়া, যয়ীম আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরা। পরের দিন বিভিন্ন প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোশারফ হোসেন, রিজিওনাল নাযেম। ইজতেমা কমিটির সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ দুলাল মিয়া, শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। শেষে সভাপতির ভাষণ, আহাদ পাঠ এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত ইজতেমায় ৪৫ জন আনসার উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে ১৮তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমার কার্যক্রম শেষ হয়।

মোহাম্মদ দুলাল মিয়া

নারায়ণগঞ্জে নওমোবাঈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ৩১/০৮/২০১২ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুয়া আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে নওমোবাঈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন নায়েব আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা পাটওয়ারী। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৭ জন নওমোবাইনসহ মোট ৪৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলন উদ্বোধন করা হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন নওমোবাইন সদস্য তরিকুল ইসলাম। বাংলা নযম পেশ করেন নওমোবাইন সদস্য আমজাদ হোসেন। নওমোবাইনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে বক্তব্য দেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. হাফেজ আবুল খায়ের। মালি কুরবানীর গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন নওমোবাইন সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আরফানুর রহমান এবং রাশেদ আলম নামাযের গুরুত্ব এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। গিবত ও

জামাতের সৌহার্দ সম্পর্ক এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন লাজনার ভাইস প্রেসিডেন্ট দিলরুবা বেগম। অত:পর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ও দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

তাহের আহমদ প্রধান

বিষ্ণুপুরে নও মোবাঈন দিবস পালন

গত ৩১ আগষ্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিষ্ণুপুরে নও মোবাঈন দিবস পালন করা হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বিষ্ণুপুর মসজিদে বাদ জুমুআর পর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মৌ. আব্দুল হাকিম, মোয়াল্লেম। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। নও মোবাইন রমজান আলী পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং নও মোবাইন জসিম উদ্দিন নজম পরিবেশন করেন। স্থানীয় জামাতের যয়ীম, কায়েদ ও ৩ জন নও মোবাইন উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের পর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে ৯ জন নও মোবাইন, ২ জন মেহমানসহ ১৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

আব্দুল হাকিম

বিষ্ণুপুর আখাউড়া আনসারুল্লাহ্‌র ৪র্থ স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বিষ্ণুপুর মসজিদে মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ বিষ্ণুপুর ও আখাউড়ার ৪র্থ বার্ষিক স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় এবং শুক্রবার সকাল ৮টায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও আহাদ পাঠ, দোয়া ও নযম পরিবেশনের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোশারফ হোসেন। বক্তব্য রাখেন মকবুল আহমদ, মওলানা নওসাদ আহমদ, মোবাশ্বের মুরব্বী, মৌ. আব্দুল হাকিম মোয়াল্লেম, শফিকুল আলম এবং ফালাহ উদ্দিন। উপস্থিত আনসারগণের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইজতেমা প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সভাপতির সমাপনী ভাষণ শেষে দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমা শেষ হয়। এতে ১৫ জন আনসারসহ মোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

শফিকুল আলম

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ বিষ্ণুপুরে ১ম স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৮ সেপ্টেম্বর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ বিষ্ণুপুরের উদ্যোগে ১ম বার্ষিক স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা মোফাত্তেস। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, আহাদ পাঠ, দোয়া ও নযম পরিবেশনের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ বিষ্ণুপুরের সদস্যাগণের প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণে ইজতেমা প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। এতে ২২ জন লাজনা, ১০ জন নাসেরাতসহ প্রায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট বেগম খালেদা আহমদ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দোয়ার আহ্বান করেন।

শেফালী বেগম

ফতুল্লায় ৫ দিন ব্যাপী তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১৫-১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী ফতুল্লা মসজিদ নূরে প্রত্যহ বাদ মাগরিব মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ ফতুল্লার ২য় বার্ষিক ইজতেমার প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে তরবীয়তী ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খাকসার উক্ত ক্লাস পরিচালনা করি। ক্লাসে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আলোচিত হয়। (১) কুরআন তেলাওয়াত–বিভিন্ন সূরা ও সূরার অংশ। (২) অর্থসহ নামায–জুমুআর নামায ও সাধারণ নামায। (৩) বিভিন্ন দোয়া–আযানের, জানাযার, দোয়াকুনুত। (৪) দ্বীনি মালুমাত প্রশ্ন ও (৫) বক্তৃতা দেওয়ার প্রস্তুতি ৫ দিনের এই ক্লাসে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট যয়ীম আনসারুল্লাহ্‌ সহ মোট ১০ জন আনসার উপস্থিত ছিলেন। ক্লাসের কারণে গত ২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর ইজতেমাতে সবাই ভাল করতে পেরেছেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব ফজলুর রহমান ও ফজল-ই-ইলাহী প্রশংসা করেছেন প্রতিযোগীদের।

৭ দিন ব্যাপী নামায শিক্ষা ক্লাস

গত ২৪-০৯-২০১২ হতে ৩০-০৯-২০১২ পর্যন্ত মোট ৭ দিন অর্থসহ নামায শিক্ষার ক্লাস প্রত্যহ বাদ মাগরীব অন্যান্য দরসের পরিবর্তে নেওয়া হয়। খাকসার উক্ত ক্লাস পরিচালনা করি। কেন্দ্রীয় অর্থসহ নামায শিক্ষার লিফলেট মোতাবেক এই ক্লাস চলে। ফতুল্লাতে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ও যয়ীম আনসারুল্লাহ্‌সহ সর্বমোট ২০ জন উক্ত ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন। অত্যন্ত সুন্দর ভাবে নামাযের নিয়মাবলী, অযুর নিয়ম ও দোয়া অর্থ শিখানো হয়েছে। এতে আনসার, খোদ্দাম ও আতফালরা ছিল। এছাড়া ওয়াকফে নও শিশুদের ক্লাসেও অর্থসহ নামাযের বিষয়টি নেওয়া হয়। এখানে আল্লাহ্‌র ফজলে অনেকেই জুমুআর নামায, জানাযার নামায ও সাধারণ নামায পড়ানোর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

পুরুলিয়ায় নওমোবাঈন দিবস পালন

গত ০১/০৯/২০১২ তারিখ বাদ আসর পুরুলিয়ার হালকা ভরতপুরেন নওমোবাঈন দিবস পালিত হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব সালেহ আহমদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। নওমোবাঈন দিবস সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মুবাশ্বের মুরব্বী মওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ, জনাব নুরুল ইসলাম, সবশেষে সভাপতির ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

আল আমিন হক তুষার

জামালপুর হবিগঞ্জ এর নও মোবাঈন দিবস পালন

গত ১১/০৯/২০১২ বাদ যোহর স্থানীয় মসজিদে জাঁকজমকপূর্ণভাবে নওমোবাঈন দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন নওমোবাঈন জনাব লিটন আহমদ চৌধুরী। এরপর নওমোবাঈন দিবস সম্পর্কে ও আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পরিচিতি এবং হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আগমনের উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্ত ভাবে পর্যায়ক্রমে আলোকপাত করেন জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী আকন্দ (বায়তুল মাল ইন্সপেক্টর) ও ডা: রফিক আহমদ চৌধুরী। পরিশেষে সমাপ্তি ভাষণ দান করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয় এবং দোয়ার মাধ্যমে সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত দিবসে আহমদী ২১ জন, মেহমান ২০ জন, নওমোবাঈন ৮ জন, মোট ৪৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

খিলাফত দিবস

গত ১৭ আগষ্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ চট্রগ্রামের উদ্যোগে খিলাফত-দিবস উদযাপন করা হয়,

আলহামদুলিল্লাহ্। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম মওলানা ফিরোজ আলম এবং স্থানীয় আমীর মোহতরম মাহমুদ হাসান সিরাজী। মওলানা সাহেব সবার উদ্দেশ্যে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ প্রেসিডেন্ট 'খিলাফতের প্রতি আনুগত্য' সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০ জন সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

রোকসানা বেগম

ফতুল্লায় আনসারুল্লাহর দ্বিতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার মজলিস আনসারুল্লাহ্ ফতুল্লার উদ্যোগে দু' দিন ব্যাপী দ্বিতীয় বার্ষিক-ইজতেমা 'মসজিদ নূর'-এ অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত ইজতেমায় মোহতরম সদর সাহেবের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম ফজল-ই-ইলাহী ও মোহতরম ফজলুর রহমান। ইজতেমা উপলক্ষে তরবিয়তী বক্তব্য রাখেন মোহতরম আবুল হাশেম বীরপ্রতীক, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লা, মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, কারকুনে খাস, সদর মজলিস এবং মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন। ইজতেমার শুভ উদ্বোধন করেন মোহতরম শামসুদ্দিন আহমদ, যয়ীম, মজলিস আনসারুল্লাহ্ ফতুল্লা। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, খেলাধূলা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। বাজামাত তাহাজ্জুদ আদায় ইজতেমাকে আরো বরকতমন্ডিত করে তোলে।

কাজী মোবাশ্বের আহমদ

শোক সংবাদ

আমার পিতা জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মাহিগঞ্জের সদস্য, গত ১৯ সেপ্টেম্বর রোজ বুধবার দুপুর ১২-৩০ মনিটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তার জানাযার নামায পরদিন সকাল ৭-৩০ মিনিটে মাহিগঞ্জ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জানাযার নামাযে সকল আহমদীসহ এলাকার বিশেষ সংখ্যক অ-আহমদী অংশ নেয়। তারপর স্থানীয় জামাতের কবরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি স্ত্রী, ৪ ছেলে, ৩ পুত্রবধূ, ২ নাতি-নাতনী, বৃদ্ধা মা-সহ অনেক আত্মীয়-স্বজনকে শোকাহত করে চলে যান। তিনি মজলিস আমেলার যয়ীমে আলা হিসেবে ২০১০-১১ ছিলেন এবং বর্তমানে মুস্তাজিম মাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আমাদের পরিবার ও আমার পিতার রূহের মাগফেরাতের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

(২) অত্যন্ত দু:খের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, লাজনা ইমাইল্লাহ সুন্দরবনের সদস্যা আমার আম্মা বেগম নুরুন্নাহার সফরুদ্দীন গত ৯ আগষ্ট, ২০১২ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় নিজস্ব বাড়িতে অসুস্থতা এবং বার্ধক্য জনিত কারণে হঠাৎ হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তিনি মুসী ছিলেন, তার ওসীয়্যত নং-৩৩২২৮। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ৫ মেয়ে, ১ জন ওয়াকফে জিন্দেগী ছেলেসহ ১২জন নাতী, ৯জন নতনী এবং ১৩জন পালিত ছেলেমেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি মূর্খ মানুষ ছিলেন কিন্তু জামাতের প্রতি, খিলাফতের প্রতি গভীর ভালবাসা রাখতেন। মেহমান নেওয়াজী ছিলেন। দীর্ঘদিন অসুস্থতা ভোগ করে মৃত্যুবরণ করেন। আমার মা রমযানে মৃত্যুর আশা করতেন, মহান খোদার কৃপায় রমযানেই তার মৃত্যু হয়েছে।

উল্লেখ্য তার স্বামী শেখ সফরুদ্দীন সাহেব ৭ ডিসেম্বর ২০০৪ নিজ বাসভবনে সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিনিটে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তার মৃত্যুতে শ্রদ্ধেয় হুযূর (আই.), ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং আনসারুল্লাহ্‌র সদর সাহেব শ্রদ্ধাঞ্জলী ও শোক জ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাক্ষিকে এলানের জন্য লেখা হয়নি। তাই এক সাথে তার মৃত্যুর তারিখটিও জানিয়ে দিলাম। তিনি প্রত্যেক দিন তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন, আহমদী হবার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জামাতের কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী, মহান আল্লাহ্ যেন বেগম নুরুন্নাহার সফরুদ্দীন এবং শেখ সফরুদ্দীন সাহেবকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মোকাম দান করেন, আমীন।

শেখ আব্দুল ওয়াদুদ
মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের চট্টগ্রাম আহমীদয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য ***আলহাজ্ব রফিউজ্জামান (লিটন)*** গত ৩ অক্টোবর ২০১২ সকাল অনুমানিক ১১.০০ ঘটিকায় ঢাকাস্থ ল্যাব এইড ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৫৮ বৎসর। পরের দিন আর্থাৎ ৪ অক্টোবর' বৃহস্পতিবার বাদ যোহর চট্টগ্রামস্থ বায়তুল বাসেত মসজিদ প্রাঙ্গনে তাঁর নামাজে জানাজা শেষে আহমদিয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের মুরাদপুরে অবস্থিত কবরস্থানে মরহুমের দাফন সুসম্পন্ন হয়। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও মরহুমের জানাজা এবং দাফনে চট্টগ্রামের আহমদী ও স্থানীয় বহু গণ্যমাণ্য গয়ের আহমদী ভাইরা অংশ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, মরহুম নিয়মিত একাধারে তবলীগকারী, সাহসিকতার মানুষ এবং নেক কাজের প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে আর্থিক কুরবানির ক্ষেত্রে সবসময় প্রথম সারিতে থাকার চেষ্টা করতেন।

আমরা পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার মাধ্যমে, মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করি এবং আল্লাহ্ তাআলা যেন মরহুমকে বেহেস্তের উচ্চ মোকাম ও পরিবারবর্গকে সবরে জামিল দান করেন, আমীন।

খালিদ আহাম্মদ সিরাজী
সেক্রেটারী ইশায়াত, চট্টগ্রাম

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- **জনতা সেনেটারী**
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 75 | 7th & 8th Issue
The Ahmadi Fortnightly
15 & 31 October, 2012 Tk. 15.00
Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com